বরণীয় যাঁরা স্মরণীয় যাঁরা

ডেল কার্নেগি

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

আল জোলসন : দারিদ্র্যকে যিনি জয় করেছিলেন..4
ইভানজিলিন বুদ : একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুখী মহিলা....................................7
উইলিয়াম রেন্ডলফ্ হার্স্ট : যার মাসিক আয় দশ লক্ষ ডলার.........................11
উইলিয়াম শেক্সপিয়ার : ইংরেজি সাহিত্যের কিংবদন্তি..................................13
উড্রো উইলসন : বিশ্বশান্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন..16
এনরিকো কারুজো : মূল্যবান কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন 18
এন্ড্রু কার্নেগি : অন্যদেরকেও ধনী করে তুলতেন...22
ওয়েন্ডেল পরিবার : নিউইয়র্কের সবচেয়ে অদ্ভুত ধনী পরিবার.......................26
ক্যাপটেন রবার্ট ফ্যালকন স্কট : দক্ষিণ মেরুতে ভ্রমণকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি 30
ক্লাইভ বিটি : সার্কাসশিল্পী..34
ক্লেরান্স ডেবরা : একজন শ্রেষ্ঠ আইনজীবী...38
চার্লস ডিকেন্স : বিস্ময়কর ও জনপ্রিয় লেখক..40
জন ডি. রকফেলার : যার ধন সম্পদ এখনো বেড়ে চলেছে 45

জে. পি. মর্গান : একজন বিশিষ্ট ধনকুবের, যিনি ছিলেন অখ্যাত ও রহস্যময় .48

জ্যাক লন্ডন : যাঁর আয় ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের আয়ের দ্বিগুণ 50

ডায়মন্ড জিম ব্রেডি : একজনের জন্য এক মিলিয়ন ডলার দিতে চেয়েছিলেন .53

থিয়োডর রুজভেল্ট : বুকে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরেও বক্তৃতা থামান নি............57

ফ্রান্সিস ইয়েটস ব্রাউন : যিনি তার জীবনে অনেকগুলো জীবনযাপন করেছেন 60

ফ্লোরেঞ্জ জিগফেল্ড : ইতিহাসের যে-কোনো ব্যক্তির চেয়ে তিনি অধিক সংখ্যক 63

বিলি সানডে : একজন জনপ্রিয় ধর্মপ্রচারক..67

বেজিল জেহারফ : লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাধিপ্রস্তর হল তাঁর স্মৃতিসৌধ..........70

ভূমিকা : বরণীয় যারা স্মরণীয় যারা 73

মার্টিন জনসন : ভ্রমণের জন্যে রাঁধুনি হয়েছিলেন 76

মেয়ো ভ্রাতৃযুগল : আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত চিকিৎসক 81

লরেন্স টিবেট : প্রত্যাখান তাকে অনেকদূর নিয়ে গেছে 84

লর্ড বায়রন : মানুষের মাথার খুলিতে করে মদ পান করতেন 87

লায়ানল ব্যারিমোর : নিজের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ পান নি.....92

লিও টলস্টয় : জীবনবাদী লেখক 96

শিক সেল : একটি বইয়ের জনপ্রিয় লেখক...99
সমারসেট মম্ : একজন বিশ্বখ্যাত লেখকের নেপথ্য কথন..........................101
সিনক্লেয়ার লুইস : তিনি নোবেল বিজয়ী হলেন 105
হাওয়ার্ড থার্সটন : একজন বিখ্যাত জাদুকর...109
হেটি গ্রিন : তার আয় ছিল ঘণ্টায় তিন শ ডলার অথচ................................113
হেলেন কিলার : যাকে নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল 116

আল জোলসন : দারিদ্র্যকে যিনি জয় করেছিলেন

আমেরিকায় মাত্র একজন অভিনেতাই আছেন যিনি এক মিলিয়ন ডলার মূল্যের চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক চিত্র তৈরি করেন এবং হলিউডের সবচেয়ে বেশি বক্স অফিস হিট করা চিত্রটি নির্মাণ করেছেন, যে ছবি এক কোটি কুড়ি লক্ষ ডলার আয় করতে সক্ষম হয়েছে। এই বিখ্যাত ব্যক্তিটির নাম আল জোলসন। আপনারা তাকে ছবিতে দেখেছেন, তার গাওয়া গান মুখে মুখে আবৃত্তি করেছেন এবং কৌতুক শুনে হেসেছেন। তার আসল নাম আশা ইউয়েন্সন-কিন্তু তিনি সবার কাছে আল জোলসন নামেস পরিচিত।

জোলসন কিছুমাত্র কাজ না করেই প্রায় এক মিলিয়ন ডলার বেতন পান। তার নিয়োগকারী ইউনাইটেড আর্টিস্টস-এর হাতে কোনো ছবি বানাবার স্ক্রিপ্ট ছিল না বলে তাকে বিনা কাজে এই বেতন দিতে বাধ্য হয়েছিল।

একসময় তিনি এমন এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটালেন যা হলিউডের চিত্রশিল্পকে এক সম্ভাবনাময় ও উজ্জ্বলতার শিখরে পৌঁছে দিল। তখন চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে একটা মন্দাভাব বিরাজিত ছিল। তার আজীবনের বন্ধু ইউনাইটেড আর্টিস্টের প্রধান জোসেফ সেকংক তখন ব্যবসায়ে প্রচুর লোকসান দিচ্ছিলেন। তার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিপত্র অনুসারে জোলসন তখনো এক মিলিয়ন ডলার পাওনা আছেন; কিন্তু জোলসন সেই চুক্তিপত্রটা ছিঁড়ে ফেললেন এবং জোসেফকে ফেরত দিয়ে বললেন, আমি যখন কোনো কাজ করারই সুযোগ পাচ্ছি না, আমাকে কোনো পয়সাকড়ি দেবার প্রয়োজন নেই।

বাল্যকালে জোলসনের যক্ষ্মা হয়েছিল একবার। তিনি হাসপাতলের এক দাঁতব্যচিকিৎসালয়ে গেলেন। ডাক্তার তাকে বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র দিলেন। কিন্তু ওষুধ আনতে গেলে যখন জানতে পেলেন এক বোতল ওষুধের জন্য তাকে দশ সেন্ট মূল্য দিতে হবে তখন দশ সেন্ট তার কাছে ছিল না–ওই ওষুধটা আজ পর্যন্ত তিনি পান নি। বলা বাহুল্য ওই ওষুধ ছাড়াই তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন। কিন্তু দশ সেন্টের অভাবে ওষুধটা কিনতে না পারাতে তার মনের অনুভূতি কী হয়েছিল তা কোনো দিনও ভোলেন নি। এই অনুভূতির ফলশ্রুতিতে তিনি লেক সেরানেকের যক্ষ্মা হাসপাতালে গরিবদের বিনা পয়সায় চিকিৎসার্থে বছরে বিশ হাজার ডলার দান করেন।

আমি একসময় জোসনকে তার জন্ম তারিখের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে বললেন যে, তিনি জানেন না। দরিদ্র পিতামাতার খড়ের চাল আর পাথরের মেঝে-অলা এক ছোট্ট ঘরে তার জন্ম হয়। সেখানকার প্রতিটি বছর ছিল একই রকমের বৈচিত্র্যহীন। বাবা-মা তার মতো একটা ছেলের জন্মতারিখ মনে রাখার মতো একটা নগণ্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামালেন না। তিনি বিখ্যাত হবার পর বন্ধুরা জন্মদিনের উপহার দিতে চাইলে তাকেই একটা পছন্দসই জন্মতারিখ বের করতে হল। তিনি জানতেন বসন্তকালে অভিনেতাদের আর্থিক অবস্থা ভালো থাকে! তাই সে মাসটাকে জন্মগ্রহণের মাস বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। ঠিক করলেন জন্মতারিখ হবে–১৯৮৮ সালের ২৬ মে।

একদা জোলসনকে ওয়াশিংটন থেকে নিউইয়র্ক আসার জন্য কপর্দকহীন অবস্থায় চুরি করে গাড়ি চড়ে আসতে হল। তিনি তখন এতই আনাড়ী ছিলেন যে নিউ জার্সির নিউইয়র্কে গাড়ি পৌঁছলে তিনি তা নিউইয়র্ক মনে করে নেমে পড়লেন! যখন ভুল বুঝতে পারলেন

তখন তাকে মশার কামড় খেয়ে ঘাসের ঝোপে ঘুমোতে হল। পরে যখন নিউইয়র্ক পৌঁছলেন তখন তিনি পার্কের বেঞ্চ কিংবা ট্রাকের উপর অনাহারে ও অনাদরে।

লি সুবার্ট নামে এক ভদ্রলোক মন্তব্য করেছিলেন যে, আমেরিকায় মাত্র দু-জন অভিনেতাই আছেন যারা যে কোনো বড় শহরে গিয়ে কেবলমাত্র জনপ্রিয়তার জোরে যে কোনো রঙ্গমঞ্চ দর্শকে ভরিয়ে দিতে পারেন-তাদের একজন হলেন ফ্রেড স্টোন, অপরজন এই আল্ জোলসন। প্রথম অবস্থায় অভিনয় ক্ষমতা, দক্ষতা ও দারিদ্র্যের জন্য হতাশ ছিলেন কিন্তু পরে নিজের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলেই হতে পেরেছিলেন বিশাল অর্থশালী ও বিখ্যাত অভিনেতা।

ইভানজিলিন বুদ : একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুখী মহিলা

ইভানজিলিন বুদ ছিলেন শুক্র আক্রমণের জন্য ঘটিত সালভেসন আর্মির প্রধান সেনা নায়িকা। তার বাহিনীতে তিরিশ হাজার অফিসার পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছত্রিশটি দেশের ক্ষুধার্তদের ক্ষুধা দূর করার এবং আশিটি বিভিন্ন ভাষায় প্রেম বিতরণে রত ছিল।

তিনি ছিলেন একজন সবচাইতে মনোমুগ্ধকর এবং আকর্ষণীয় মহিলা, তাঁর কাছে কম করে হলেও একহাজার বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল। কোটিপতি থেকে শুরু করে জেলে কৃষক শ্রেণীর লোকেরা তাঁর পাণি প্রার্থনা করেছে কিন্তু তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে চিরকুমারী থেকে গেলেন। তাঁর বয়স সত্তর বছর হয়ে যাবার পরেও তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল।

ইভানজিলিন ছিলেন সত্যিই একজন চমৎকার মহিলা। আমি শুনেছি যখন তাঁর দাদি নানি হওয়ার বয়স হয়ে গিয়েছিল তখন তার লালচে কালো চুলগুলোতে সবে দু-এক গাছি পাক ধরতে শুরু করেছিল। তখনো তারুণ্যের উচ্ছলতায় ঝলমল করছেন। তিনি একটি দুর্দান্ত লক্ষনরত ঘোড়ায় চড়তেন এবং অনায়াসে তাকে বাগে আনতে পারতেন। ঘোড়া মালিকেরও ঐ ঘোড়ার পিঠে চড়তে সাহস হল না বল ইভানজিলিন খুব সস্তায় ঘোড়াটি কিনে নিয়েছিলেন, তার নাম ছিল 'গোল্ডেন হার্ট'। যখন তিনি এর পিঠে সওয়ার হয়ে চিৎকার করে বলতেন, 'ওকে যেতে দাও।'

গোল্ডেন হার্ট তখন একবার লাফিয়ে একবার বসে এবং সামনে-পিছনে পাশে দোলাদোলি শুরু করে দিত। তারপর ছুটে চলত। তিনি ঘোড়াটিকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। প্রতিদিন সকালে তিনি একঘণ্টা ঘোড়া চালাতেন। একহাতে লাগাম ধরে আর অন্য হাতে কাগজে লেখা বক্তৃতা দিয়ে জঙ্গলের মধ্যদিয়ে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে নিয়ে যেতেন আর বক্তৃতা আবৃত্তি করেতেন।

ইভানজিলিন বুদ একবার তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন। ঘটনা ঘটেছিল তখন যখন ইউক্রেনের নব-আবিষ্কৃত স্বর্ণখনির দিকে সবাই ছুটে চলছে। অজস্রলোক দ্রুতবেগে স্বর্ণখনির দিকে ছুটে চলছে। ইভানজিলিন বুঝতে পারলেন যে সেখানে সালভেসন আর্মির প্রয়োজন হবে। দুইজন নার্স ও তিন-চারজন সহকারী নিয়ে ইউক্রেনে যাত্রা করলেন। যখন স্ক্যাগওয়েতে পৌঁছলেন তখন সেখানে ভীষণ অভাবে অনেকেরই খাবার জুটছিল না, তারা সবাই বন্দুক নিয়ে ঘুরছিল। তিনি শুনতে পেলেন লোকেরা ইউক্রেনের ডিলিঞ্জার ক্লনডাইকের হত্যাকারী সোপি স্মিথ সম্বন্ধে বলাবলি করছিল। সোপি স্মিথ দল বল নিয়ে ওত পেতে থাকত এবং খনিজীবীরা খনি থেকে ফেরার পথে তাদের কাছে থেকে স্বর্গরেণু কেড়ে নিতে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য এক সশস্ত্র পুলিশ দল প্রেরণ করে কিন্তু স্মিথ তাদের সবাইকে গুলি করে হত্যা করে। ইভানজিলিন যেদিন সেখানে পৌঁছেন সেদিনও পাঁচজন হতভাগ্যকে জীবন দিতে হয়েছিল। ইভানজিলিন সে রাতে ইউক্রেন নদীর তীরে একটা ধর্মসভা করেন।

পঁচিশ হাজার নিঃসঙ্গ লোকের কাছে তিনি ধর্ম প্রচার করেন এবং অনেক বছর আগে তারা তাদের মায়ের মুখে যে গান শুনেছিল তাদেরকে দিয়ে সেই গান গাওয়ালেন যিশু, আমার

আত্মার প্রেমিক, আমার ঈশ্বরের নিকটবর্তী তোমাকে এবং বাড়ি, মায়াভরা বাড়ি। ওই রাত্রিটি ছিল অসম্ভব শীতের, তিনি যখন গান গাচ্ছিলেন, একব্যক্তি একটা কম্বল এনে তার গায়ে জড়িয়ে দিল। রাত ১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলার পর লোকজনকে ধন্যবাদ দিয়ে বুদ ও তার সঙ্গীরা পাইনগাছের নিচে মাটিতে ঘুমুতে গেলেন। তারা অস্ত্রহাতে একদল লোককে এগোতে দেখলেন। লোকগুলি তাদের কাছে এসে থামল এবং দলপতি টুপি খুলে বলল, আমি সোপি স্মিথ, আর আমি জানাতে এসেছি যে আপনার গান আমার খুবই ভালো লেগেছে। আপনি গান গাচ্ছিলেন তখন কম্বলটা আমিই আপনার জন্য পাঠিয়েছিলাম। ইচ্ছে করলে আপনি ওটা রেখে দিতে পারেন। একটা কম্বলকে হয়তো একটা উপহারসামগ্রী বলে মনে হবে না কিন্তু যেখানে শীতে ও আর্দ্রতায় লোক মারা যাচ্ছিল সেখানে এটা ছিল একটা রাজকীয় উপহার। বুদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন স্ক্যাগওয়েতে তিনি কোনো বিপদে পড়বেন কি না। সে উত্তর দিল, ‘না, আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ অন্তত নয়। আমি আপনাকে রক্ষা করবো।’ ইভানজিলিন অত্যন্ত আশ্বস্ত হলেন। তারার নিশীথসূর্যের আলোকিত রাতে তিনি তার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কথা বললেন। তিনি বললেন, আমি জীবন দিচ্ছি আর তুমি তা নিচ্ছ, এটা ঠিক নয়। তুমি জয়লাভ করতে পার না, তারা দু’দিন আগে বা পরে তোমায় হত্যা করবে। তার সঙ্গে শৈশব এবং মা সম্বন্ধে কথা বললেন। স্মিথ আবেগে বিগলিত হয়ে বলল, সে তার দাদির সাথে মুক্তিবাহিনীর সভায় যেত, গান গাইত এবং হাততালি দিত। সে স্বীকার করল যে, মৃত্যুশয্যায় তার দাদি তাকে, তারা মুক্তিবাহিনীর সভায় যে গানটা একত্রে শিখেছিলেন, সে গানটা গাইতে বললেন। সে গেয়েছিল,

“আমার অন্তর এখন তুষারের চেয়ে শুভ্র
কারণ এখানে যিশু বাস করছেন!

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

আমার পাপ অসংখ্য কিন্তু আমি জানি
তা ক্ষমা পেয়েছে।
তাই আমার সত্তায় আর কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই।”

মিস বুদ তাকে তার সাথে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নতজানু হতে বললেন। তারপর মুক্তিবাহিনীর একজন মেয়ে আর উত্তরাঞ্চলের সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত ডাকাত সোপি স্মিথ একসাথে নতজানু হয়ে বসে প্রার্থনা করলেন এবং কাদলেন। সোপির চোখে তখন অশ্রু ঝরছিল। সে বুদের হাত ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করল যে সে আর মানুষ খুন করবে না এবং সে আত্মসমর্পণ করবে। বুদও তার কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন যে তার শাস্তি লঘু করার জন্য সরকারের ওপর তার সমস্ত প্রভাব খাটাবেন। ভোর চারটায় স্মিথ চলে গেল। সকাল নয়টায় সে তার কাছে টাটকা রুটি, পিঠা, আর এক পাউন্ড মাখন পাঠিয়ে দিল। এসব খাদ্য ছিল সেখানে খুবই মূল্যবান। এর দুদিন পর সোপি স্মিথ খুন হল আর তার হত্যাকারীর সম্মানার্থে স্ক্যাগওয়েবাসী একটা স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করল।

ইভানজিলিন ছিলেন একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুখী ব্যক্তি। এইজন্য সুখী যে তিনি অন্যের জন্য জীবন যাপন করতেন। তার জীবনের নিগূঢ় বাসনা হল কুলি মজুর থেকে শুরু করে যত লোকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে তাদের প্রত্যেককে আর একটু ভালো করা।

উইলিয়াম রেন্ডলফ্ হার্স্ট : যার মাসিক আয় দশ লক্ষ ডলার

আপনি কি কখনো ভেবেছেন, আপনার যদি এখন দশ লক্ষ ডলার থাকত তা হলে আপনি কী করতেন? উইলিয়াম রেন্ডলফ হারে মাসিক আয় হল দশ লক্ষ ডলার। আর তার জীবনের এ অধ্যায়টুকু পড়তে পড়তেই তার আয় বেড়ে যাবে আরো একশত ডলার।

উইলিয়াম রেন্ডলফ হাস্টকে কেউ উইলিয়াম বলে ডাকতো না। বন্ধুরা তাকে ‘ডব্লিউ আর’ আর কর্মচারীরা বলত ‘দ্য চিফ’। তিনি হলেন দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী প্রকাশক। আমেরিকার সবচেয়ে উদ্যোগী এই প্রকাশক সমন্ধে আমি বিস্ময়কর যে জিনিষটা জানি তা হল, তিনি একজন মুখচোরা এবং লাজুকপ্রকৃতির লোক। শত শত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে চুটিয়ে আড্ডা দিয়েছেন, তবু নতুন কোনো লোকের সাথে আলাপপরিচয় করা তিনি অপছন্দ করতেন।

পাশ্চাত্যজগতের সবচেয়ে জমকালো ভূসম্পত্তি হল হাস্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াস্থ ভূসম্পত্তি। এটার পরিমাণ আড়াই লক্ষ একর আর সাগরের শিলাময় উপকূল বরাবর পঞ্চাশ মাইল সুবিস্তৃত। প্রশান্ত মহাসাগরের গর্জনশীল পৃষ্ঠদেশ থেকে দুই হজার ফুট উপরে তিনি একখানি অভিজাত প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন, যার নাম দিয়েছেন ‘জাদুর পাহাড়। প্রাসাদকে সুরক্ষিত করার জন্য হার্স্ট লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানায় অসংখ্য বাঘ, সিংহ, জিরাফ, জেব্রা, মহিষ আর পাখপাখালি রয়েছে। তিনি এত বেশি চারু

ও কারু শিল্প কিনেছিলেন যে শুধু সেগুলি সংরক্ষণ করার জন্যই নিউইয়র্কে তাকে একটা বড়সড় গুদামঘর কিনতে হয়। এই গুদামঘরে বিশজন কর্মচারী আছে, এটাকে চালু রাখার জন্য বছরে ষাট হাজার ডলার খরচ হয়।

উইলিয়াম রেন্ডলফের বাবা মিসৌরীয় একজন কৃষক ছিলেন। তিনি উনপঞ্চাশের স্বর্গজোয়ারের সময় পশ্চিমবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং দুই হাজার মাইল পথ পায়ে হেঁটে ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। সোনা আবিষ্কারের মাধ্যমে তিনি লক্ষ লক্ষ ডলারের মালিক হতে পেরেছিলেন।

হার্স্ট একজন দক্ষ সৌখিন ফটোগ্রাফার ছিলেন। প্রতি বছরে হাজার ফটো তোলেন। তিনি দক্ষ রাইফেল চালকও ছিলেন। হার্স্ট ছিলেন ক্লগ নর্তক, চমৎকার অনুকরণকারী ভাড় এবং উত্তম কথক। তার স্মরণশক্তি ছিল অদ্ভুত। একদিন জিমি ওয়াকার ও চার্লি চ্যাপলিন হার্স্টের ক্ষেত-খামার ভ্রমণের সময় বাইবেলের একটা অংশের সঠিক কথাগুলি নিয়ে দু-জনে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হলে হার্স্ট সেই অংশটুকু হুবহু আবৃত্তি করে দিয়ে তাদেরকে হতবাক করেছিলেন এবং বিবাদের নিষ্পত্তি করলেন। হার্স্ট তাঁর বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পান তিন কোটি ডলার। তাই স্বচ্ছন্দে জীবন কাটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তার সম্পদ বাড়ানোর জন্য তিনি পঞ্চাশ বছর ব্যাপী দশ থেকে পনের ঘণ্টা পরিশ্রম করেছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, নেহায়েত ঈশ্বর যদি তাকে নিরত না করেন তাহলে কোনোদিনই কাজ থেকে অবসর নেবেন না।

উইলিয়াম শেক্সপিয়ার : ইংরেজি সাহিত্যের কিংবদন্তি

ইংরেজি সাহিত্যের কিংবদন্তি আর সারা পৃথিবীর শ্রদ্ধেয় কবি ও সাহিত্যিক উইলিয়াম শেক্সপিয়ারকে মাত্র তেরো বছর বয়সে স্কুল ছাড়তে হয়েছে। একদিন শ্রেণীকক্ষে বালক শেক্সপিয়ার আনমনা হয়ে গালে হাত দিয়ে জানলার খিড়কি গলিয়ে নীলাকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কিছু একটা ভাবছিলেন। তা দেখে শিক্ষক তাকে বলেছিলেন, বাবা, তোমার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকার। বলা বাহুল্য শিক্ষকের এই ভবিষ্যদ্বাণী যে সঠিক হয় নি তা আপনারা সকলেই জানেন।

স্কুল ছেড়ে বালক শেক্সপিয়ার গরুর দুধ দোয়াতেন, ভেড়ার লোম ছাড়াতেন, মাখন বানাতেন আর কাঁচা চামড়া প্রস্তুত করতে বাবাকে সাহায্য করতেন। তাঁদের পরিবারের মধ্যে বাবা-মা, বোন, নাতনী কেউই লিখতে পড়তে জানতেন না। অথচ তিনিই বিশ্বসাহিত্যাঙ্গনে এক অভূতপূর্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

শেক্সপিয়ার যতদিন জীবিত ছিলেন তখন তাঁর প্রতি এবং সৃষ্টির প্রতি কেউ মনোযোগ দেয় নি। তার মৃত্যুর একশ বছর পরেও তার নাম ছিল প্রায় অজ্ঞাত। তারপরে তার সম্পর্কে লক্ষ লক্ষ শব্দ রচনা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত যত লেখক হাঁসের পালকের কলম দিয়ে তাদের বিদ্যে শানিয়েছেন তাদের সবার সেক্সপিয়ারের উপরই আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে সর্বাপেক্ষা অধিক। প্রতি বছর হাজার হাজার লোক তাঁর জন্মতীর্থ দর্শনে যান। তাদের মধ্যে আমিও একজন-আমি খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে স্লেটারিতে হেঁটে যেতাম, যে মাঠ দিয়ে এক আনাড়ী গ্রাম্যবালক একসময় দ্রুত হেঁটে যেত তার প্রণয়িনী এ্যান ওয়েটলির

সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। শেক্সপিয়ার ভাবতেও পারেন নি যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লোকে তার গান গাইবে।

শেক্সপিয়ারের জীবনে তার বিয়েটা ছিল ট্রাজেডিপূর্ণ। তিনি এ্যান ওয়েটলিকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন কিন্তু তাঁর চন্দ্রালোকিত সুষমাপূর্ণ রজনীগুলির শেষদিকে তিনি এ্যান হেথাওয়ে নামী অপর এক তরুণীর সাহচর্যে তার নিয়তিকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ মহিলা যখন জানতে পারল যে তার প্রেমিক আরেকজনকে বিয়ে করার জন্য অনুমতিপত্র নিয়েছেন তখন সে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। শেক্সপিয়ারের স্ত্রী ছিল তার চেয়ে আট বছরের বড় এবং প্রথম থেকেই তাদের বিয়েটা ছিল একটা নিদারুণ প্রহসন। তাই শেক্সপিয়ার তাঁর অনেক নাটকে ছেলেদেরকে নিজের চেয়ে বেশি বয়সের মহিলাদের বিয়ে করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন।

শেক্সপিয়ার যখন মারা যান তখন সে সময়কার বিচারে তিনি একজন ধনী ব্যক্তি। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় লন্ডনে অতিবাহিত করেছিলেন। লন্ডন আসার পাঁচ বছরের মধ্যে একজন অভিজ্ঞ অভিনেতা হিসেবে যথেষ্ট সুনাম ও অর্থ উপার্জন করতে থাকেন। তিনি দুটো থিয়েটারের শেয়ার ক্রয় করেন। এবং চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে প্রতি বছরে প্রায় ২০,০০০ ডলার করে আয় করতে থাকেন। কিন্তু তিনি তার উইলে স্ত্রীর নামে একটি সেন্টও লিখে যান নি। তার স্ত্রীর কপালে ছিল তার বিষয় সম্পত্তির মধ্যে শুধু একটা বড় পালঙ্ক। তাও শেক্সপিয়ার এটা তাঁর নামে লিখেছিলেন বেশ কয়েকবার ভেবে। কারণ কথাটা উইল শেষ করার পর কোনো এক লাইনের ফাঁকে লিখে দিয়েছিলেন।

শেক্সপিয়ারের মৃত্যুর সাত বছর গত হয়ে হাওয়ার পর তাঁর নাটকগুলো বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। আপনি যদি নিউইয়র্কে তাঁর প্রথম সংস্করণটি কিনতে চান তা হলে আপানকে সিকি মিলিয়ন ডলার মূল্য দিতে হবে। অবশ্য শেক্সপিয়ার নিজেও সম্ভবত হ্যামলেট, ম্যাকবেথ ও মিডসামার নাইটস ড্রিম-এর মতো নাটকের জন্য ছয়শ ডলার পান নি। নিজ গ্রামের ছোট এক গির্জার সামনে ধর্মপ্রচার বেদীর পাশে তাকে কবর দেয়া হয়েছিল। এই সম্মানিত স্থানে তাকে কবর দেয়ার অর্থ তার প্রতিভার প্রতি সকলের সম্মান বোধও নয় অথবা তার প্রতি ভালোবাসার বহিপ্রকাশও নয়। যার কপালে লেখা আছে ইংরেজি সাহিত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হওয়ায় তাঁকে গির্জায় কবর দেওয়া হয়েছিল এজন্য যে, তিনি নিজের শরহটাকে টাকা ধার দিয়েছেন। যদি সাইলক চরিত্রের স্রষ্টা তার নিজের শহরটাকে ধার দিতেন তাহলে কোনো পরিচয়হীন কবরে তার হাড়গুলোর কথা হয়তো লোকে আজ ভুলেই যেত।

উড্রো উইলসন : বিশ্বশান্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন

উড্রো উইলসন সম্পর্কে বলা হয়–তিনি ছিলেন একটি বিশাল প্রতিভা, আবার বলা হয়–তিনি ছিলেন একটি বিরাট ব্যর্থতা। তিনি বিশ্ব শান্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং সেই স্বপ্নের বেদীমূলে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

১৯১৯ সালে উড্রো উইলসন যখন ইউরোপে যাত্রা করেন তখন তাকে যুগশ্রেষ্ঠ ত্রাণকর্তা অভিহিত করে রক্তাক্ত ইউরোপে দেবতাজ্ঞানে স্বাগত জানানো হয়। তাকে ত্রাণকর্তা হিসেবে সম্মান দিয়ে অনশনকারী কৃষকগণ তার ছবির সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা জানাল। সমগ্র বিশ্ব তার পদতলে লুটিয়ে পড়েছিল। অথচ এর তিন মাস পর তিনি যখন অসুস্থাবস্থায় দেশে ফিরলেন কোটি কোটি লোক এমনকি বন্ধুরাও তার শত্রু হয়ে দাঁড়াল। ইতিহাস তাকে আখ্যা দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে উইলসন ছিলেন অত্যন্ত বেশি মানবিকতাবোধসম্পন্ন। তিনি মানুষের সাথে একান্ত নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন।

হোয়াইট হাউসে যারা বাস করেছেন তাদের মধ্যে উইলসনই ছিলেন সম্ভবত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতব্যক্তি যদিও এগারো বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া শেখেন নি। জীবনের অধিকাংশ সময় অধ্যাপনা এবং শিক্ষাঙ্গনের ছায়াময় পরিবেশে কাটিয়েছেন। তিনি ছিলেন গরিব। অধ্যাপক হিসেবে তার আয় এত কম ছিল যে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য উপরি আয়ের পন্থা হিসেবে তার স্ত্রী ছবি আঁকতেন। তিনি খাওয়াদাওয়া ও বেশভুষার ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন। তার সামনে যা এনে দেওয়া হত তিনি তাই খেতেন। তার একমাত্র

বিলাস ছিল বই কেনা। তিনি জীবনে মাত্র একটি চুরুট টেনেছিলেন এবং তা শেষ করার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়েন।

উইলসন ছিলেন যথেষ্ট আবেগপ্রবণ অথচ লোকে তাকে রুজভেল্টের চেয়েও উগ্রস্বভাবের লোক বলে ধারণা করত। তার প্রথমা স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ ছিল অত্যন্ত গভীর। তাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তার অন্যতম প্রধান কাজ ছিল স্ত্রীর জন্য পশমের পোশাক কিনে দেয়া। তিনি আইনবিদ হওয়ার লক্ষে জীবনযাত্রা শুরু করেন কিন্তু আইনে ব্যর্থতার পরিচয় দেন। সারা জীবনেও নিজে কোনো মামলা পরিচালনা করেন নি। শুধু এক মক্কেলের সম্পত্তি তদারক করেছিলেন, মক্কেলটি হল তার মা।

উইলসনের চরিত্রের প্রধান ত্রুটি ছিল তার কলাকৌশলের অভাব। ছোটবেলা থেকেই তিনি উচ্চাকাঙ ক্ষা পোষণ করতেন যে, একজন কূটনীতিক হবেন। এভাবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা অভ্যেস করতেন। কিন্তু তিনি জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আয়ত্ত করতে শেখেন নি, সেটা হল-লোকজন পরিচালনা। সেজন্য তার জীবনটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট হিসেবে শেষ বছরটিতে উইলসন স্বাস্থ্যগতভাবে অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তার অবসর গ্রহণের পর পৃথিবীর সব জায়গা থেকে লোকজন এস. স্ট্রিটে তার বাড়িতে তীর্থভ্রমণে এসেছিল।

এনরিকো কারুজো : মূল্যবান কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দুর্লভ ও মূল্যবান কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন এনরিকো কারুজো। তাঁর বয়স যখন মাত্র দশ, বাবা তাকে স্কুল ছাড়িয়ে এক কারখানায় কাজে ঢুকিয়ে ছিলেন অর্থোপার্জনের জন্য। কিন্তু সঙ্গীতের প্রতি অসম্ভব ঝোঁক ছিল তাঁর। তাই কারখানার কাজ শেষ করে প্রতি দিন সন্ধ্যায় বাড়িতে বসে সঙ্গীতচর্চা করতেন।

বাড়ির কাছে কোথাও গান গাওয়ার সুযোগ পেলে তিনি আনন্দে আটখানা হয়ে যেতেন। কোনো মহিলার জানালার নিচে দাঁড়িয়ে কলকণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য যুবকেরা তাকে ভাড়া করে নিত। নিজের একাগ্র সাধনার ও পরিশ্রমের ফলে অবশেষে যখন তিনি সত্যি সত্যিই অপেরায় গান গাওয়ার সুযোগ পেলেন, তখন মহড়ার সময় এত বেশি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন যে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে অক্ষম হলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ভাঙা কাঁচের টুকরোর মতো খানখান করে ভেঙে পড়তে থাকল, বেশ কয়েকবার বিফল হয়ে শেষে কেঁদেই ফেললেন। তারপর কাঁদতে কাঁদতে মঞ্চ থেকে পালিয়ে গেলেন।

যখন তিনি প্রথম এক গীতিনাট্য অনুষ্ঠানে জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন তিনি ছিলেন মাতাল। তখন তিনি এতই মাতাল ছিলেন যে, শ্রোতারা শিস দিয়ে চিৎকার করে এক মহা হই হুল্লোড় বাধিয়ে দিল। তাদের হট্টগোলের আড়ালে এনরিকোর কণ্ঠস্বর একেবারে তলিয়ে গেল। কোনো এক সন্ধ্যায় গীতিনাট্যের প্রধান অংশগ্রহণকারী নায়ক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এনরিকোও তখন সেখানে ছিলেন না। তাকে খোজার জন্য রাস্তায়-রাস্তায় লোক পাঠানো হল। তাকে খুঁজে পাওয়া গেল মাতাল অবস্থায়। খবর পেয়ে তিনি

যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে নাট্যমঞ্চের দিকে ছুটে চললেন। যখন তিনি রূদ্ধশ্বাসে এবং উত্তেজনায় নাট্যমঞ্চে পৌঁছলেন, তখন ড্রেসিং রুমের গরম আর মদের নেশায় তাঁর সহ্যক্ষমতা সীমা ছাড়িয়ে গেল। সমস্ত রঙ্গমঞ্চটা তার চোখের সামনে নাগরদোলার মতো ভো ভো করে ঘুরতে লাগল। কারুজো যখন মঞ্চে ঢুকলেন, তাঁর অবস্থা দেখে উত্তেজিত দর্শকরা আরো হট্টগোল বাধিয়ে তুলল, রঙ্গালয়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। অনুষ্ঠানের পর তীব্রভাবে তিরষ্কার করা হল। এতে ভগ্নহৃদয়ে ও হতাশমনে সেদিন কারুজো আত্মহত্যা করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন।

তাঁর পকেটে তখন ছিল মাত্র একটি লিরা যা কিনা এক বোতল মদের মূল্য। সারাদিন আহার না করে মদ পান করে কাটালেন আর আত্মহত্যার মতলব আঁটতে থাকলেন, কীভাবে আত্মহত্যা করবেন। তিনি যখন আত্মহত্যার পরিকল্পনা করছিলেন তখন হঠাৎ ঝড়ের বেগে এক লোক রঙ্গমঞ্চ থেকে তাঁর কাছে ছুটে এল। সে বলল, ‘কারুজো শিগগির এসো, রঙ্গমঞ্চের লোকজন অন্য গায়ককে পছন্দ করছে না, ওরা তাকে মঞ্চ থেকে তিরস্কার করে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওরা শুধু তোমার জন্য চিৎকার করেছে। কারুজো বিশ্বাস করলেন না তার কথা। আশ্চর্য হয়ে বললেন, ওরা তো আমার নামও জানে না। লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ওরা তোমার নাম জানে না। তবু তোমাকেই চায়। চিৎকার করে ঐদিনের মাতালটাকেই খুঁজছে।’

তারপর একটু একটু করে বাড়তে লাগল এনরিকো কারুজোর সুনাম ও জনপ্রিয়তা। পরিণত বয়সে তিনি বনে গেলেন একজন যশস্বী গায়ক।

প্রথম দিকে তার কণ্ঠস্বর এত হালকা ও চিকন ছিল যে তার শিক্ষক তাকে বলেই বসলেন, 'তোমাকে দিয়ে গান গাওয়া হবে না, জানালার খড়খড়ির ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের মতো তোমার কণ্ঠস্বর।' এতে তার উৎসাহ ও অনুশীলন বেড়ে চলল এবং তা জাদুময় কণ্ঠস্বরে পরিণত হল। তাই খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করে প্রথম জীবনের দুঃখময় ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও অগ্নিপরীক্ষার কথা মনে পড়ল।

মাত্র পনের বছর বয়সে তার মা মারা যান। মাকে বড় ভালোবাসতেন তিনি। তাই সারা জীবন যেখানেই গেছেন, মায়ের ছবিটা সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তার একুশ ভাই বোনদের মধ্যে শৈশবেই আঠারো জন মারা যায়। তার মা ছিলেন একজন সাধারণ মহিলা। সারা জীবন কঠোর পরিশ্রম ও দুঃখ কষ্ট ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছু জোটে নি। এনরিকোর প্রতি অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন তিনি। তাই তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। এনরিকো বলেছেন, 'আমি যাতে গান শিখতে পারি তার জন্য আমার মা জুতো পরা ছেড়ে দিয়েছিলেন।'

ইতালির অন্যসব চাষী পরিবারের মতো তিনিও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন। জ্যোতিষীর পরামর্শ না নিয়ে কখনো ভ্রমণে বেরোতেন না। তিনি শুক্রবারে নূতন পোশাক পরিধান করতেন না, নূতন জায়গায় ভ্রমণে যেতেন না, নূতন কোনো কাজেও হাত দিতেন না। এগুলো ছাড়া তিনি ছিলেন একজন রুচিশীল ভদ্রলোক।

পৃথিবীর সর্বপেক্ষা দুর্লভ এবং মূল্যবান কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন এনরিকো কারুজো। অথচ তিনি একজন প্রকৃত ধূমপায়ী ছিলেন। তিনি বলতেন, ধূমপান তার কণ্ঠস্বরের কোনো ক্ষতি করে না। প্রতিটি অনুষ্ঠানে মঞ্চে ঢোকার আগে দু-এক ঢোক হুইস্কি পান করতেন। তিনি

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ডাক টিকেট আর দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা সগ্রহ করতেন। ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনে তিনি অসাধারণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

এনরিকো কারুজো জন্মগ্রহণ করেছেন নেপলসে। তার নিজের শহরের লোকেরা তাঁর গান পছন্দ করত না, পত্রিকায় তার সমালোচনা হত, সেজন্য তার মনে গভীর দুঃখ ছিল বলে নিজে শহরবাসীদেরকে কোনোদিন ক্ষমা করেন নি। জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করার পর প্রায়ই নেপলসে ফিরে যেতেন কিন্তু তাদের কাছে থেকে গান পাওয়ার প্রস্তাব এলে অত্যন্ত তিক্ততার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করতেন।

কারুজো যখন মারা যান তখন কয়েক মিলিয়ন ডলারের মালিক তিনি। শুধু ফোনোগ্রাফ রেকর্ড থেকেই কারুজো দুই মিলিয়ন ডলারেরও বেশি উপার্জন করতেন। যৌবনে দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতায় তিনি এতই বিতৃষ্ণ হয়েছিলেন যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিটি খরচের হিসেব লিখে গেছেন।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে যখন এনরিকো কারুজো মারা যান তখন সমগ্র ইতালিবাসী শোকে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। কারণ তারা জেনেছিল, স্মরণকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম কণ্ঠস্বরটি চিরকালের জন্য নীরব হয়ে গেল।

এন্ড্রু কার্নেগি : অন্যদেরকেও ধনী করে তুলতেন

এন্ড্রু কার্নেগি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তার পরিবারের দারিদ্র্যতাহেতু ডাক্তার বা ধাত্রীর পরিচর্যার সুযোগ পান নি। ঘণ্টায় দুই সেন্ট পারিশ্রমিক দিয়ে যার আয় শুরু, শেষপর্যন্ত তিনি উপার্জন করলেন মোট চল্লিশ কোটি ডলার।

ছেলেবেলায় এন্ড্রু মাকে প্রায়ই বলতেন, ‘মা, আমি একদিন ধনী হব, তখন তোমার সিল্কের পোশাক হবে, চাকরবাকর হবে, ঘোড়ার গাড়ি হবে।‘ তার বক্তব্য অনুসারে তার সমস্ত বুদ্ধি মা’র কাছ থেকেই পেয়েছেন। অবশ্য মার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাই তাঁর জীবনের অন্যতম প্রেরণা। স্কটল্যান্ডের ডানফার্মালিনে যে ছোট্ট বাড়িটিতে এন্ড্রুরা প্রথম বাস করতেন তাতে মাত্র দুটি ঘর ছিল। নিচের তলায় বাবা তাঁতের কাজ করতেন আর ওপরের ঘরটিতে রান্নাবাড়া, খাওয়া থাকা সবই করতে হত।

কার্নেগি পরিবার যখন আমেরিকায় এল, বাবা টেবিলক্লথ বুনে বাড়ি বাড়ি ফেরি করে বিক্রি করতেন আর মা এক জুতো প্রস্তুতকারকের অধীনে কাজ করতেন। এন্ড্রুর পরার জামা ছিল মাত্র একটি। প্রতি রাতে মা সেটা ধুয়ে ইস্ত্রি করে দিতেন। বয়স যখন বাইশ হল, এন্ড্রু মার কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, মা, যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন বিয়ে করবেন না। অবশ্যি তিনি তা করেন নি।

তিনি যখন বিয়ে করলেন তখন বয়স হয়েছিল বাহান্ন আর প্রথম সন্তান যখন জন্ম নিল তখন তার বয়স বাষট্টি। তার মা মারা যাওয়াতে এত গভীরভাবে দুঃখিত হয়েছিলেন যে,

পনের বছর যাবত মা'র নামোল্লেখও সহ্য করতে পারতেন না। মায়ের মতো দেখতে এক মহিলার বাড়ি বন্ধকী ঋণ তিনি পরিশোধ করে দিয়েছিলেন।

এন্ড্রু কার্নেগি 'স্টিল কিং' নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু স্টিল নির্মাণের ব্যাপারে তার হাজার হাজার কর্মচারী তার চেয়ে বেশি জানত। তিনি শুধু জানতেন কীভাবে মানুষকে পরিচালনা করতে হয় আর এটাই তাকে ধনী হতে সাহায্য করেছিল।

ছেলেবেলাতেই তিনি ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব দেবার কৌশল আয়ত্ব করেছিলেন। তাঁর মা খরগোস ধরেছিলেন। কিন্তু তিনি ক্ষুদ্র খরগোসটার খাবার যোগাড় করতে না পারায় একটা চমৎকার মতলব আঁটলেন। পাড়ার ছেলেদের বললেন, তারা যদি খরগোসের খাবার এনে দিতে পারে তা হলে তাদের সম্মানার্থে খরগোসের বাচ্চাদের নামকরণ করবেন। ঐ একই বুদ্ধিমত্তা তিনি তার ব্যবসায়ে লাগালেন। পেনসিলভানিয়া রেলরোডে তিনি স্টিলের রেল বিক্রি করতে ইচ্ছে করলেন। তিনি পিটসবার্গে একটা বৃহদাকার স্টিলের কারখানা তৈরি করে তৎকালীন পেনসিলভানিয়া রেল রোডের প্রেসিডেন্ট জে, এডগার টমসনের নামে এই স্টিল মিলের নামকরণ করলেন। স্বভাবতই মি. টমসন খুশি হয়ে প্রয়োজনীয় ইস্পাতের তৈরি রেলের অর্ডার দিলেন।

এন্ড্রু কার্নেগি পিটসবার্গে টেলিগ্রাফ বার্তাবাহকের একটা চাকুরি পেলেন। তার মাইনে ছিল দৈনিক পাঁচ সেন্ট। এটা তার কাছে এক পরমসৌভাগ্য বলে মনে হল। অল্পতেই তিনি ওই শহরের প্রতিটি বাণিজ্যিক এলাকার কারখানার নাম ঠিকানা আয়ত্ত করে ফেললেন। এরপরে তার বাসনা হল অপারেটর হবার। যার জন্য রাত জেগে টেলিগ্রাফি পড়তেন এবং খুব ভোরে দৌড়ে অফিসে পৌঁছেই টেলিগ্রাফের চাবি টেপার অভ্যাস করতেন। একদিন

সেই কাঙ্ক্ষিত সুযোগটি এল। একদিন সকালে বিরাট সব খবরে টেলিগ্রাফের তার গরম হয়ে ওঠে। ফিলাডেলফিয়া থেকে ভয়ানক উত্তেজিত পরিস্থিতিতে পিটসবার্গের সাহায্য কামনা করছিল। তখন কোনো অপারেটর কর্তব্যরত ছিল না। এন্ড্রু কার্নেগি তখনি দৌড়ে গিয়ে সংবাদটা গ্রহণ করলেন এবং টেলিগ্রাফের মাধ্যমে যথাস্থানে পৌঁছে দিলেন। এ কাজটির জন্য তাকে অপারেটর করে বেতন দ্বিগুণ করা হল।

পরবর্তীতে তার অক্লান্ত কর্মক্ষমতা, সুচতুর বুদ্ধি বিবেক ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাকে ডিভিসনাল সুপারের প্রাইভেট সেক্রেটারিপদে পদোন্নতি দিলেন। এরপর একদিন রেলগাড়িতে হঠাৎ করে এক আবিষ্কারকের সঙ্গে সাক্ষাৎ তার সৌভাগ্যের দরজা খুলে দিল। আবিষ্কারক নিজের আবিষ্কৃত একটি স্পিলিং কারের মডেল তাকে দেখালেন। কার্নেগি অনুধাবন করতে পারলেন আবিষ্কারটি সম্ভাবনাময়। তিনি টাকা ধার করে ওই কাজে কিছু শেয়ার কিনলেন। এতে কোম্পানি তাকে ভালো লভ্যাংশ দিল এবং এভাবেই তার বিনিয়োগ থেকে বছরে পাঁচ হাজার আয় হল। একবার রেলপথে একটা কাঠের পুল পুড়ে গিয়েছিল। তখন কাঠের পুলের দিন শেষ হয়ে গিয়েছিল। এন্ড্রু কার্নেগি একটা কোম্পানি গঠন করে লোহার ব্রিজ তৈরি শুরু করলেন। এতে তার এত প্রচুর অর্থলাভ হতে থাকল যে তা তাকে অভিভূত করে দিল।

এভাবে তার অধ্যবসায় ও বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে অনেক উপরে উঠলেন কার্নেগি, বিস্তারিত হলেন চমৎকার ও সুন্দরভাবে। এর মূলে অসাধারণ ভাগ্য ছিল তার সহায়। তারা কয়েক বন্ধু মিলে পশ্চিম পেনসিলভানিয়ায় চল্লিশ হাজার ডলার দিয়ে একটি তৈলখনির কারখানা কিনলেন এবং একবছরের মধ্যে দশ লক্ষ ডলার আয় করলেন। কার্নেগির সাতাশ বছর বয়সে তার সাপ্তাহিক আয় এসে দাঁড়িয়েছিল এক হাজার ডলারে। ১৮৬২ সাল আমেরিকায়

এক বিপ্লবের সূচনা হল। এক বিস্ময়কর যুগে তখন আমেরিকা প্রবেশোন্মুখ। কার্নেগির ইস্পাতের অগ্নিকুণ্ড থেকে ক্রমাগত ধূম্ররাশি উদগীরণ হতে থাকল-কার্নেগি উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করলেন। অবশেষে তিনি বিপুল ধনরাশি উপার্জন করলেন যা মানবজাতির ইতিহাসে এখন পর্যন্ত কেউ কল্পনাও করে নি। এসব ধনরাশি উপার্জনের বেলায় তাকে বেশি কঠোর পরিশ্রম অবশ্য করতে হয় নি। তিনি নিজেকে এমন সব সহকারী দ্বারা পরিবেষ্টিত রাখতেন যারা তার চাইতে বেশি জানতেন। কার্নেগি তার অংশীদারের লাভের অংশ পুরোপুরি দিতেন। তিনি যত কোটিপতি তৈরি করেছিলেন যা এ যাবৎ আর কেউ তা পারেন নি।

জীবনে মাত্র চার বছর স্কুলে গিয়েছিলেন কার্নেগি। তা সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি ভ্রমণকাহিনী, রচনা ও জীবনী এবং অর্থনীতির বই লিখেছেন। তিনি পাবলিক লাইব্রেরিগুলোতে ষাট মিলিয়ন ডলার দান করেছিলেন এবং শিক্ষার অগ্রগতির জন্য দিয়েছিলেন প্রায় আশি মিলিয়ন ডলার। তিনি গির্জায় সাত হাজারেরও বেশি পাইপ অর্গান দান করেন। তিনি তিনশত পঁয়ষট্টি মিলিয়ন ডলার দান করেছিলেন। তার অর্থরাশি দান করার সর্বোত্তম উপায় তাকে কে বলে দিতে পারে তাই নিয়ে খবরের কাগজে প্রতিযোগিতা চলত এবং পুরস্কার ঘোষণা করা হত। অথচ এন্ড্রু কার্নেগি বিবৃত করেছিলেন যে, ধনী হয়ে মরাটা এক চরম অপমান ও লজ্জাকর ব্যাপার।

ওয়েন্ডেল পরিবার : নিউইয়র্কের সবচেয়ে অদ্ভুত ধনী পরিবার

ওয়েন্ডেল পরিবার ছিল নিউইয়র্কের সবচেয়ে ধনী পরিবার। হিসেব করে দেখা গেছে ওয়েন্ডেল পরিবারের সম্পত্তির মূল্য দশ কোটি ডলারেরও বেশি।

একজন অবিবাহিত ভাই ও তার চিরকুমারী বোনেরা একটি প্রাসাদোপম বাড়িতে বাস করত। বাড়িটা যখন তৈরি হয় তখন আব্রাহাম লিঙ্কন ইলিনয়ের একজন অখ্যাত আইনজীবী। নিইউয়র্কের সর্বাধিক আলোচিত বাড়িটি ছিল ৩৯ নং স্ট্রিটের ফিফথ অ্যাভিনিউতে। লোকে এটাকে রহস্যময় বাড়ি বলে আখ্যায়িত করেছিল। এ বাড়িকে কেন্দ্র করে জমে উঠত বহু রহস্যময় গল্প, প্রবন্ধ, নাটক এমনকি চলচ্চিত্রও। আপনারা যদি কখনো বাসে চড়ে কিংবা পায়ে হেঁটে ফিফথ অ্যাভিনিউতে গিয়ে থাকেন তা হলে আপনার চোখে পড়বে ওয়েন্ডেলদের বাড়িটি আর তার সামনে কুকুরদের খেলা করার জন্য দশ লক্ষ ডলার মূল্যের একটি মনোরম উদ্যান।

ওয়েন্ডেল পরিবারের সদস্যরা ছিল রক্ষণশীল স্বভাবের এবং সনাতন পদ্ধতি অবলম্বন করে জীবন নির্বাহ করত। বিদ্যুতের আলোর পরিবর্তে গ্যাসের আলো ব্যবহার করত, রেডিও আর মোটরগাড়ি ব্যবহারের প্রয়োজন মনে করত না। তাদের পরিবারে আধুনিক উপকরণ ছিল শুধু একটি টেলিফোন সেট। সেটা কেনা হয়েছিল পরিবারের শেষ ব্যক্তিটির মৃত্যুর দুদিন আগে–প্রয়োজন হলে ডাক্তার হলে ডাকার জন্য।

এত সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও ওয়েন্ডেল পরিবারের লোকেরা অতীত যুগেই বাস করত।

জন গটলিয়ার ওয়েন্ডেল ১৯১৪ সালে মারা যান। তার সবকটি পোশাক ছিল গৃহযুদ্ধের শেষে ক্রয় করা তার একপ্রস্থ পোশাকের অনুকরণে তৈরি। চল্লিশ বছর আগে তিনি যে বাক্সে করে পোশাকটা এনেছিলেন সেটাতেই ওই পোশাকটা রাখতেন। তিনি রং করা কোনো পোশাক পরতেন না। যখন কালো পোশাক পরতে চাইতেন তখন স্কটল্যান্ডের কোনো ফার্ম থেকে কালো রঙের ভেড়ার পশম আনিয়ে নিতেন। কি বৃষ্টি, কি রোদ, কি শীত, কি গ্রীষ্ম সব সময়ই একটা ছাতা থাকত তার হাতে। একটা খড়ের টুপি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ওটাকে বছরের পর বছর ধরে ব্যবহার করতেন। ঋতুর শুরুতে তা রাঙিয়ে নিতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সব রকমের রহস্যময় রোগের সংক্রমণ ঘটে পায়ের তলা দিয়ে। তাই নিজের দেহ এবং মাটির জীবাণুর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য এক ইঞ্চি পুরু গাটাপার্চা দিয়ে জুতোর সোল তৈরি করিয়ে পরতেন। ঐ সময় তিনিই ছিলেন নিউইয়র্কের শ্রেষ্ঠ জমিদার। তিনি গ্যাট হয়ে বসে থেকে তার চারপাশে শহর গড়ে উঠতে দিয়েই বড়লোক হয়ে গেলেন। ওয়েন্ডেল বোনেরা মদ্যপান অপছন্দ করতেন। জন গটলিয়ার ওয়েন্ডেলের সাতজন বোন ছিল এবং তাদের যাতে বিয়ে না হয় তজ্জন্য তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন। তার আশঙ্কা ছিল, যদি তাদের বিয়ে হয় ও সন্তান সন্ততি হয় তা হলে ভূ-সম্পত্তি খণ্ডিত হয়ে যাবে। তিনি বোনদের সাবধান করে দিতেন যে সবাই তাদের টাকার পিছনেই ছুটছে এবং যখন পুরুষরা তাদের সাথে দেখা করতে আসত গটলিয়ার সরাসরি তাদেরকে আবার আসতে নিষেধ করতেন। এই সাত বোনের একজন মাত্র বিয়ে করেছেন ষাট বছর বয়সে। অন্যান্যারা বুড়ো হয়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। অর্থ যে কত অর্থহীন হতে পারে তার করুণ দৃষ্টান্ত তাদের ব্যর্থ

জীবনকাহিনী। বোনদের মধ্যে সবচেয়ে তেজস্বী ছিলেন জর্জিয়ানা। তিনি পরিবারে সনাতন ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাকে বাড়ি থেকে সরিয়ে কুড়ি বছর মানসিক হাসপাতালে রাখা হল। তিনি পাঁচ মিলিয়ন ডলারের মালিক ছিলেন; কিন্তু এই অর্থ তাকে পাঁচ সেন্টের সুখও এনে দিতে পারে নি।

ওয়েন্ডেল পরিবারের বোনেরা যখন মারা পড়লেন, একে একে তাদের ঘরে জানালাগুলি বন্ধ করে। দেয়া হল এবং দরজায় তালা লাগিয়ে দেয়া হল। সর্বশেষ বোন মিস এলা ওয়েন্ডেল তার শোবার ঘর, নিচতলার খাবার ঘর এবং উপর তলার খালি বড় ঘর যেখানে তিনি বোনদের সাথে স্কুল জীবন দিনগুলো অতিবাহিত করেছিলেন–

তিনি কয়েকটি ঘর খোলা রেখে বাকিগুলো বন্ধ করে রাখতেন। অনেক বছর তিনি ওই ভয়াবহ চল্লিশ কামরাওয়ালা ভুতুড়ে বাড়িতে একাকী বাস করছেন। আর তার সাথী ছিল হাতে গোনা কয়েকজন বিশ্বস্ত চাকর, কয়েকটি ফরাসি কুকুর, টবি।

এই অদ্ভুত ধনী পরিবারে শেষ উত্তরাধিকারী এলা ওয়েন্ডেল যখন মারা যান তখন তিনি মিশনারি কাজের জন্য মেথাডিস্ট চার্চকে লক্ষ লক্ষ ডলার দান করে যান। মারা যাওয়ার পূর্বে তাদের পরিবারে কোনো আত্মীয় জীবিত ছিল বলে তিনি জানতেন না। কিন্তু মৃত্যুর একবছরের মধ্যেই হঠাৎ করে ছাতার মতো প্রায় দুহাজার তিনশ আত্মীয় নামধারী অংশীদার গজিয়ে উঠল। তাদের সবাই অংশীদারিত্ব দাবি করে বসল-কেবলমাত্র টেনেসিতেই দুশো নব্বই জন তথাকথিত আত্মীয় তার পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পত্তির এক একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দাবি করে বসল। জার্মান দূতাবাস চারশ জার্মানের পক্ষ থেকে এক ঢালাও দাবি জানাল আর চেকোশ্লোভাকিয়া এত বেশি উত্তরধিকারিত্ব দাবি

করে বসল যে ফরেন অফিসের মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করতে হল। দুব্যক্তি তো সম্পত্তির লোভে নিজেদেরকে জন ওয়েন্ডেলের ছেলে বলে দাবি করল এবং প্রচার করতে লাগল যে জন ওয়েন্ডেল তাদের মাকে গোপনে বিয়ে করেছিলেন।

জন গটলিয়ার ওয়েন্ডেল কখনো উইল করেন নি। কারণ তিনি চান না কোনো উকিল তার সম্পত্তি থেকে দু-পয়সা করে নিক। কিন্তু তার ফল হয়েছিল বিপরীত। ওই সম্পত্তির ভাগ বণ্টন হওয়ার আগেই আড়াইশো জন উকিল ওয়েন্ডেলদের বিশাল সম্পত্তি থেকে তাদের সঠিক পাওনা পকেটে পুরে ফেলল।

ক্যাপটেন রবার্ট ফ্যালকন স্কট : দক্ষিণ মেরুতে ভ্রমণকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি

দক্ষিণ মেরুতে ভ্রমণকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি ক্যাপটেন বার্ট ফ্যালকন স্কটের কাহিনীটি ছিল বেশ বীরত্বপূর্ণ ও অনুপ্রেরণাদায়ক কিন্তু সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক। রস আইস ব্যারিয়ার স্কট ও তার দু'জন সঙ্গী যে দুঃখজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তা আজো মানুষের মনে আলোড়ন ও সহানুভূতির সৃষ্টি করে। ১৯১৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের এক বিকেলে তার মৃত্যুসংবাদ লন্ডনে পৌঁছার সাথে সাথেই সমস্ত ইংল্যান্ড শোকে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।ট্রাফালগারে নৌ সেনাপতি নেলসনের মৃত্যুর পর আর কোনো ঘটনা তাদের এত স্তব্ধ করতে পারে নি। বাইশ বছর পর একটি মেরু জাদুঘর নির্মাণ করে ইংল্যান্ডবাসী তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে, অর এটাই হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর। এই জাদুঘরে তার স্মৃতির উদ্দেশে একটা ল্যাটিন বাক্য খোদিত আছে–

'তিনি গিয়েছিলেন মেরু রহস্য উদ্ধার করতে,
পেয়ে গেলেন ঈশ্বর রহস্যের সন্ধান।'

ক্যাপটেন স্কট 'টেরা নোভা' জাহাজের করে দক্ষিণ মেরুর দিকে ধাবিত হলেন এবং যে মুহূর্তে মেরু বৃত্তের বরফাচ্ছাদিত জলের ওপর দিয়ে চলা শুরু করেন তখনই তা কাঁধে সওয়ার হল অদৃষ্টের নির্মম পরিণতি।

স্কট তার গন্তব্যের দিকে এগোতে থাকলেন। সাগরের বিশাল ঢেউগুলো জাহাজের গায়ে আছড়ে পড়ছিল আর পাটাতনের উপরকার জিনিসপত্রগুলো ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পানি জাহাজের খোলের ভিতরে প্রবেশ করতে লাগল বয়লারের আগুন নিভে গিয়েছিল এবং সমুদ্রের প্রবল নিষ্পেষণে জাহাজটা অসহায় অবস্থায় দুলতে থাকল।

কিন্তু স্কটের দুর্ভাগ্য তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে। স্কটের সাথে খুব কষ্ট সহিষ্ণু কয়েকটা টার্টু ঘোড়া ছিল। এগুলোকে সাইবেরিয়া অঞ্চলের প্রচণ্ড শীত সহ্য করিয়ে আনা হয়েছিল, কিন্তু তাদেরকেও তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। মেরুর গুড়ো তুষারপাতে পড়ে তারা ইতস্তত ছুটাছুটি শুরু করে দিয়েছিল এবং তুষারের ফাঁকে ঘোড়াগুলোর পা ভেঙে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত গুলি করে মেরে ফেলতে হয়েছিল। ইউকোন থেকে অনেক ক'টা এস্কিমো কুকুর আনা হয়েছিল। কুকুরগুলো শীতের তাড়নায় বরফের ফাটলের কিনারায় এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল।

তারপর নিরুপায় হয়ে স্কট ও তার চার সঙ্গী নিজেরাই তাদের হাজার পাউন্ড ওজনের স্লেজগাড়ি টানতে-টানতে মেরু কেন্দ্রে চূড়ান্ত অভিযান শুরু করে দিলেন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় নয় হাজার ফুট উপরোস্থিত হিম মণ্ডলের মধ্য দিয়ে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় তারা এগিয়ে চললেন। মানব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা দুর্গম ও রহস্যাবৃত মেরু, যা সৃষ্টির প্রথম ছ'দিন থেকেই রহস্যময় থেকে গেছে–যেখানে। কিছুই বাঁচে না, শ্বাসগ্রহণ করে না, কিছুই নড়ে না, এমনকি একটা ভ্রাম্যমাণ গাংচিলও না, সেদিকেই তাদের সমস্ত শ্রম ও শক্তি ব্যয় করে তারা এগিয়ে চললেন। চতুর্দশ দিবসে তারা-স্কট ও তার দল মেরুতে পৌঁছলেন কিন্তু তাদের ভাগ্যে ছিল হতাশা আর ভীতি। তাদের অগ্রভাগে একটা লাঠির মাথায় নরওয়ের জাতীয় পতাকাটি একটুকরো ছেঁড়া কাপড়ের মতো বাতাসে দুলছিল। স্কটের আগে এই

মেরুতে যিনি এসেছিলেন তার নাম নরউইজান এমুন্ডসন। তারা বুঝতে পারলেন বহু বছরের প্রস্তুতি এবং বহু বছরের যন্ত্রণা ও ভোগান্তির পর মাত্র পাঁচটি সপ্তাহের ব্যবধান তাদের হাত থেকে বিজয় ছিনিয়ে নিল।

একরাশ পুঞ্জিভূত হতাশা নিয়ে তারা বাড়ির পথে যাত্রা শুরু করেন। সভ্যতার মাঝে তাদের প্রত্যাবর্তনের কাহিনীটি ছিল অত্যন্ত করুণ এবং দুঃখ্যাতনার আরেক মহাকাব্য। মেরুর প্রবল বায়ু প্রবাহ স্কট ও তার সঙ্গীদের সারাদেহ বরফে আচ্ছাদিত করে দিল। এমনকি তাদের চুলদাড়ি পর্যন্ত শীতে জমে গেল। তাদের সবার ধৈর্য ও শক্তি ক্রমান্বয়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে লাগল। তারা এই চরম প্রতিকূল অবস্থায় একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। অভিযাত্রীদলের সবচেয়ে শক্তিশালী অফিসার ইভান্স পা পিছলে পড়ে গেলেন এবং সবার চোখের সামনে দুঃখজনকভাবে চিরবিদায় নিলেন। দেখতে না দেখতে হিমবাহের তুষারের নিচে তার দেহটা চিরতরে ঢাকা পড়ে গেল। এবার ক্যাপটেন ওটস-এর পালা। তুষারের আঘাতে তার পা-দুটো ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল, তিনি আর হাঁটতে পারছিলেন না। ওটস বুঝতে পারলেন তার জন্য সঙ্গীরা পিছিয়ে পড়ছে। রাতে তিনি এক কাজ করে বসলেন। মৃত্যুবরণ করার জন্য তিনি তুষারঝড়ের মধ্যে হেঁটে চলে গেলেন যাতে অন্যরা বেঁচে যান।

ক্যাপটেন ওটস শান্তভাবে বললেন, আমি বাইরে যাচ্ছি, আমি কিছুক্ষণ বাইরে থাকব।' তিনি চিরকালের জন্য বাইরে চলে গেলেন। তার জমাটবাধা দেহটা আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি। যেখান থেকে তিনি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে একটা স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয়েছে যাতে লেখা আছে–এখানে আশেপাশে কোথাও প্রাণত্যাগ করেছে এক অকুতোভয় আপনজন।

দক্ষিণ মেরুতে যখন একদিন শান্তভাবে সূর্য কিরণ দিচ্ছিল তখন একদল অনুসন্ধানকারী ক্যাপটেন স্কট ও তার সঙ্গীদের জমাট দেহগুলি আবিষ্কার করল। সেখানে তাদেরকে দুটো স্কি দড়ি দিয়ে বেঁধে একটা ক্রস বানিয়ে তার নিচে তাদেরকে কবর দেয়া হল। কবরের গায়ে খোদাই করা হল লর্ড টেনিসনের কবিতার কয়েকটি চরণ যা উৎসর্গ করা হল বীরবাহুদের স্মৃতি স্মরণে।

ক্লাইভ বিটি : সার্কাসশিল্পী

ক্লাইভ বিটির কাজ ছিল পৃথিবীর অন্যতম সর্বাধিক বিপজ্জনক কাজ। বিমা কোম্পানিগুলো নিশ্চিত জানে যে, যে-কোনো সময় তার দেহটা বন্যজন্তুর নখরাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাই তারা তাঁর জীবনের ঝুঁকি নিতে রাজি হয় নি। তাকে বাঘে আঁচড়ে দিয়েছে এবং চিবিয়েছে। পায়ের হাড়ে সিংহ কামড় বসিয়ে দিলে কেমন লাগে তা তিনি অনুভব করেছিলেন। হাতিরা তাকে টেনে হিঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করেছে, একটা কালো চিতাবাধ তাঁকে কামড়ে রক্তাক্ত করেছে এবং শেষবার যখন তার সবচেয়ে বড় সিংহ 'নিরোর সঙ্গে খেলা শেষ করলেন তখন তাঁকে দশ সপ্তাহ হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল, তিনি একটা পা প্রায় হারাতে বসেছিলেন।

তিনি আমাকে বলেছেন যে, অনেকবার তিনি বাঘ-সিংহের খেলা দেখানো ছেড়ে দেবেন বলে ভেবেছেন। কিন্তু তিনি বলেন যে, একটা সাধারণ কাজ করে মরার চেয়ে বাঘ-সিংহের কামড়ে মরাটা তার কাছে অধিক শ্রেয়।

ক্লাইভ বিটি তার জীবনের রোমাঞ্চকর ও উত্তেজনাপূর্ণ জীবনের সুদীর্ঘ পনেরটি বছর সার্কাসের তাঁবুতে কাটিয়েছেন। শিশু বয়স থেকেই ছিলেন সার্কাসপাগল। একদিন শহরে বার্নাম ও বেইলি সার্কাস দল এল। এক লন্ড্রিওয়ালা তাদের জানালায় একটা পোস্টার লাগিয়ে দিয়ে গেল। তিনি অবাক হয়ে চেয়ে থাকলেন, কী সুন্দর লাল, বেগুনি ও হলুদ বর্ণের রঞ্জিত ছবিতে দেখা যাচ্ছে এক বীরপুরুষ খাঁচাভর্তি একপাল ক্রুদ্ধ সিংহের সামনে চাবুক ঘোরাচ্ছে। তিনি দৌড়ে সেই লন্ড্রিওয়ালার কাছে গিয়ে অনুনয় করে বললেন সার্কাস

পার্টি চলে গেলে ওই পোস্টার যেন তাকে দেয়া হয়। ইতোমধ্যে তিনি পাঁচটা জেদি কুকুরকে বিভিন্ন রকম খেলা শিখিয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত করে তুলেছিলেন। তিনি প্রায়ই সার্কাসের সেই পোস্টারটি রাস্তায় ঝুলিয়ে দিতেন এবং পাড়ার ছেলেদেরকে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করতেন। এরপর যখনই শহরে কোনো সার্কাসদল আসত তিনি একটা চাকুরির জন্য আবেদন জানাতেন। কিন্তু তখন অত্যন্ত কম বয়স ছিল তাঁর।

তরপর এক গ্রীষ্মকালে সেই মস্তবড় যাত্রিকদল শহর ছেড়ে চলে যেতে লাগল, ক্লাইভ বিটিও কাউকে কিছু না বলে গাড়িতে চেপে বসলেন। মা-বাবা তিন দিন ধরে অনেক খোঁজাখুঁজি করে নিরাশ হলেন। একদিন চিঠি এল, তিনি সার্কাসে খাঁচা পরিষ্কার করার একটা চাকুরি পেয়েছেন। মাসে মাত্র পাঁচ ডলার বেতন, তাঁকে বেহেস্তে বাস করার সুযোগ এনে দিল।

দশ বছরের মধ্য ওহিওর এই যুবক ইতিহাসের সকল ট্রেইনারদের ছাড়িয়ে গেল। তিনি এমন দুঃসাহসিক খেলা দেখানোর আয়োজন করলেন যে সার্কাস মালিকরা বলল এটা কোনোমতেই সম্ভব নয়। যখন দেখা গেল যে, কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেছেন তখন তারা বলাবলি করতে লাগল যে। তিনি নিশ্চয়ই একটা পাগল এবং তার জীবনের মূল্য এক কানাকড়িও না। তিনি চল্লিশটা ক্রুদ্ধ সিংহকে এক খাঁচায় পুরে চাবুক ঘুরিয়ে খেলা দেখাতেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন কাজের আদেশ দিতেন। তার এই ঝুঁকিপূর্ণ খেলাটার প্রদর্শনী সার্কাসের লোকদের মধ্যেও অদ্ভুত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। তিনি পরস্পর বিরোধী দুটো জন্তু বাঘ আর সিংহকে এক খাঁচায় পুরে বিভিন্নভাবে প্রদর্শনী করতেন। আশ্চর্য ব্যাপার হল এই, তার মতে বাগে আনার ব্যাপারে সিংহ ও বাঘ সবচাইতে সাংঘাতিক জানোয়ার নয়। তিনি বাঘ, হাতি, সিংহ, হায়েনা, ভালুক সবরকম জন্তু জানোয়ারের খেলা

দেখিয়েছেন এবং তাদের সঙ্গে বসবাস করেছেন। আপনারা অনেকেই হয়তো শুনেছেন, পশু প্রশিক্ষকরা সোজাসুজি কোনো পশুর চোখের দিকে তাকিয়ে তাকে বশ করত। ক্লাই বিটি এটাকে নিছক বাজে কথা বলে উড়িয়ে দিলেন।

তিনি বলেন, কোনো প্রশিক্ষকই কোনোদিন সিংহের মুখের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে রেখে দেয় নি। তাছাড়া সিংহের নিশ্বাস এমন দুর্গন্ধযুক্ত যে যারা সিংহ খুব পছন্দ করে তারাও গ্যাস মুখোশ না পরে তার। মুখে মাথা দিতে পারবে না। বিটিকে যদি কেউ কিছু বলে রাগাতে চায় তাহলে সিংহ পোষমানানেওয়ালা বললেই হয়। কারণ তিনি বলেন যে তিনি পোষমানানেওয়ালা নন; তিনি প্রশিক্ষক। তিনি বলেন, তার সিংহ ও বাঘেরা পোষা নয়, তারা বন্যই আছে।

তার মতে পোষা জন্তুর চেয়ে বন্য জন্তুরা বেশি কথা শোনে বা আদেশ পালন করে। তাঁকে সবচেয়ে বেশি যে প্রশ্নটা করা হয়েছিল তা হচ্ছে কোনো বাঘ ও সিংহ একে অপরের গা চাটে কি না। উত্তরে তিনি জানালেন, তার চারপাশে সিংহ ও বাঘেরা মারামারি করছে, এমন অবস্থায় তিনি বহুবার খাঁচার ভেতর ঢুকেছেন এবং দেখেছেন যে সিংহরা সবসময়ই দলবদ্ধ হয়ে যায় আর বাঘ একা একাই মারামারি করে। যখন একটা সিংহ মারামারি করে তখন আশেপাশের সমস্ত সিংহ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, বিশেষ করে তারা যদি পরস্পর ভাই হয়। তারা হচ্ছে ছোট ছেলেদের মতো, ঠিক মারামারি দেখলেই তার মধ্যে না ভিড়ে পারে না। কিন্তু বাঘের তেমন কোনো নীতিবোধ নেই। যখন সে দেখল অন্য একটা বাঘকে হত্যা করা হচ্ছে তখন সে বসে বসে হাইও তুলতে পারে। ক্লাইভ বিটির আর একটা চমকপ্রদ খেলা হল একটা ভালুককে দিয়ে ডিগবাজি খাওয়ানো। তিনি এটা হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেললেন।

একদিন তিনি এক খাঁচায় ঢুকলেন, এমন সময় একটা ভালুক হঠাৎ দাঁত বের করে উত্তেজিত হয়ে থাবা বাড়িয়ে খুনীর চোখে এগিয়ে এল তার দিকে। ভালুকটা তাকে হত্যা করার জন্যই এগিয়ে এসেছিল। তার আক্রমণ ছিল এত আকস্মিক যে ক্লাইভ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। তিনি খুব দ্রুত চিন্তা করলেন, তারপর একটু পিছিয়ে এসে ভালুকটার নাকে জোরে একটা ঘুষি বসিয়ে দিলেন। নাকে আঘাতের মতো ভালুকের কাছে আর কিছুই এত বেদনাদায়ক নয়। ঘুষিটা লাগার সাথে সাথে ভালুকটা মাটিতে পড়ে একটা ডিগবাজি খেল। তখনই ক্লাইভের মাথায় মতলবটা ঢুকল। ঐ ভালুকটাকেই পূর্ণ ডিগবাজি খাওয়াতে হলে তাকে যা করতে হয় তা হল হুইপ দিয়ে ভালুকটার নাকে আস্তে একটা টোকা মারা।

ক্লাইভ বীটি সব জন্তুকে মানুষের চেয়ে বেশি ভালোভাবে জানেন। তার সবচেয়ে প্রিয় জন্তু হল কুকুর।

ক্লেরান্স ডেবরা : একজন শ্রেষ্ঠ আইনজীবী

প্রায় পঁচাত্তর বছর আগের কথা। আমেরিকার এক স্কুল শিক্ষিকা একটা ছোট্ট ছেলেকে তার অশান্ত ও অস্থির স্বভাবের জন্য একদিন তার কানে এক চড় বসিয়ে দিলেন। সে রাস্তা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গেল। তার বয়স ছিল তখন সবেমাত্র পাঁচ, কিন্তু তার মনে হল তার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার ও অত্যাচার করা হয়েছে। এর ফলে সে নিষ্ঠুরতা এবং অবিচারকে এমনভাবে ঘৃণা করতে শিখল যে সারাজীবন সে এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হল।

ছেলেটির নাম ক্লেরান্স ডেরো, খুব সম্ভবত তিনি আমেরিকার সব চাইতে খ্যাতনামা আইনজ্ঞ এবং তাঁর সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অপরাধ-আইনজ্ঞ। তিনি ছিলেন সগ্রামী, স্বাধীনতচেতা ও নির্যাতিতের প্রতিভূ।

ক্লেরান্স ডেবরা বলেছেন, তিনি কখনো অর্থ বা সম্মান কামনা করেন নি। গণ্ডগ্রামের এক স্কুলশিক্ষক হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন তিনি। এসময় একটা চমকপ্রদ ঘটনায় তার জীবনে পরিবর্তন ঘটল। এক কর্মকার ঘোড়ার পায়ের নাল পরানোর কাজের অবসরে আইন পড়ত। ডোয়রা এক টিনের কারিগরের দোকানে এ কর্মকারকে এক আইনের মামলার ব্যাপারে যুক্তি দিয়ে তর্ক করতে শোনেন। তাঁর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বাকপটুতায় তিনি মুগ্ধ হলেন। তিনি ওই কর্মকারের কাছ থেকে আইনের বইগুলো ধার করে আইন পড়া শুরু করে দেন।

অবসর সময়ে এবং ক্লাসের ছাত্রদের অঙ্ক করানোর ফাঁকে ফাঁকে তিনি মনোযোগ সহকারে আইনের পাতা ওল্টাতে লাগলেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী ঠিক করলেন ওহিওতে একটা বাড়ি কিনবেন। বাড়িটির মূল্য ঠিক করা হল ৩৫০০ ডলার। ডেরো ব্যাংকে তার জমাকৃত অর্থ থেকে ৫০০ ডলার ওঠালেন এবং বাকি টাকা বাৎসরিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে চাইলেন। কথাবার্তা প্রায় পাকাঁপাকি এমন সময় মালিকের স্ত্রী দলিলে সই দিতে অস্বীকার করল। মহিলার ধারণা যে, ডেবরার মতো একজন সাধারণ যুবক সারাজীবনও ৩৫০০ ডলার উপার্জন করতে পারবেন না। এতে ডেরো অত্যন্ত রাগান্বিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে শিকাগো রওয়ানা হলেন। সেখানে প্রথম বছরে তিনশ ডলার আয় করলেন। পরের বছর শহরের বিশেষ এটর্নি হিসেবে আয় করলেন তিন হাজার ডলার। তিনি বলেছেন, যখন আমার ভাগ্য বদলাতে শুরু করল তখন মনে হল সব কিছু যেন ঝটপট আমার পথে চলে আসছে।

এরপর ডেরো শিকাগো এন্ড নর্থ ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে কোম্পানির জেনারেল এটর্নি নিযুক্ত হন এবং এর মাধ্যমে প্রচুর অর্থোপার্জনের পথে এগিয়ে যান। তারপর শিকাগোয় শুরু হল ধর্মঘট ও দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং রক্তপাত। তিনি রেলওয়ে কোম্পানির চাকুরি ত্যাগ করে ধর্মঘটীদের পক্ষ নিলেন। তার অগ্নিময় ও চাঞ্চল্যকর মামলাগুলির মধ্যে এটাই প্রথম। এক লোমহর্ষক খুনের মামলায় ডেরো খুনী দু-জনের সমর্থনের দায়িত্ব নিলেন-তাতে লোকে তাকে গালাগালি ও তিরস্কার করল।

এমনকি খুনীদের পক্ষ নেওয়ার জন্য তাদের চেয়েও জঘন্য বলে অপবাদ দিল। তিনি বলেন, ঘৃণা এবং বিদ্বেষের বিপক্ষে আমি কী করতে পারি তাই প্রমাণ করতে চাই। আমার কোনো মক্কেল মৃত্যুদণ্ড পায় নি, ভবিষ্যতে যদি কখনো ঘটে তবে তা হবে আমার মৃত্যুদণ্ডের সামিল। আমি সম্পূর্ণরূপে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে।

ডেরো তাঁর অপরিসীম বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার জন্য এরূপ অনেক মামলায় জিতে সুনাম অর্জন করেন এবং একজন প্রখ্যাত অপরাধ-আইনজীবী হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেন।

তিনি বলেন যে, সমাজই অপরাধী সৃষ্টি করে এবং যে কোনো লোকই যে কোনো অপরাধ করতে পারে।

ক্লেরান্স ডেরো কয়েক বছর আগে তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশ করেছেন। এতে তিনি লিখেছেন, ‘আমি ঠিক বলতে পারব না, আসলে আমি কতটুকু বেশি সমাধা করতে পেরেছি। তবে জীবনের চলার পথে যথেষ্ট পরিমাণ বড় বড় ভুল করেছি এবং ভাগ্যদেবীর কাছ থেকে যতটুকু পেরেছি সফলতা ছিনিয়ে নিয়েছি। যে-কোনো মানুষকে তার গন্তব্যস্থলের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিটি দিনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা উচিত।’

তিনি আরো লিখেছেন, ‘সারা পৃথিবীটাকে সামনে রেখে এবং ভ্রমণের জন্য যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে জীবনপথে যাত্রা শুরু করেছি মাত্র অল্পকাল আগে, এখন তীর্থযাত্রা প্রায় সমাপ্ত হতে চলেছে এবং আমার দিনও প্রায় শেষ হয়ে চলেছে। জীবনের না দেখা পথটাকে আগে কী অন্তহীন আর দীর্ঘ মনে হত, আজ পার হয়ে আসা পথটুকু মনে হচ্ছে কতই না ছোট।‘

চার্লস ডিকেন্স : বিস্ময়কর ও জনপ্রিয় লেখক

ইংরেজি সাহিত্যে সর্বাধিক গ্রন্থপ্রণেতা ও সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখক হওয়াটা ছিল তার ভাগ্যনির্ধারিত। অথচ যখন প্রথম লেখা শুরু করেন, পাছে লোকে ঠাট্টা তামাসা করবে এই

ভয়ে অত্যন্ত ভীত ছিলেন। তাঁর প্রথম লেখাটা তিনি গভীররাতে গোপনে ডাক বাক্সে ফেলে আসেন যাতে কেউ জানতে না পারে। বাইশ বছর বয়সে যখন তার গল্প সত্যি ছাপা হল, তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে কাঁদতে কাঁদতে রাস্তায় ছুটাছুটি শুরু করে দিলেন পাগলের মতো। অবশ্য ওই গল্পের জন্য তিনি একটি সেন্টও পারিশ্রমিক পান নি। তার পরবর্তী আটটি গল্পের জন্যও তিনি কিছু পেলেন না। একটা গল্পের জন্য তিনি পান মাত্র পাঁচ ডলারের একটি চেক। তার এ গল্পটি তাকে পাঁচ ডলার এনে দিয়েছিল, কিন্তু তার শেষ পাণ্ডুলিপি তাকে প্রতিটি শব্দের জন্য এনে দিয়েছে পনের ডলার। অর্থাৎ সর্বযুগের সকল লেখকের মধ্যে এটাই ছিল সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক।

এই বিশ্ববরেণ্য লেখকের নাম, চার্লস ডিকেন্স। আজ থেকে একশ বছর আগে বড়দিনের সময় লন্ডনে একটা ছোট বই প্রকাশিত হল তাঁর। এর গল্পটা তার জন্য সৌভাগ্য বয়ে এনেছিল। অনেকে এটাকে পৃথিবীর অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র বই বলে অভিহিত করেছে। যেদিন এটা প্রকাশিত হল ওইদিনই এক হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেল। এক পক্ষকালের মধ্যে আরো পনের হাজার কপি ছাপা হল। তখন থেকেই এই বইয়ের অসংখ্য সংস্করণ রেব হয়েছে এবং পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ভাষায় তার অনুবাদ হয়েছে। চার্লস ডিকেন্সের এই জগৎবিখ্যাত বইটার নাম হচ্ছে 'ক্রিসমাস ক্যারল।

গত একশ বছরে চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাসগুলো অসাধারণ রকমের বিক্রি হয়েছে। কেবল বাইবেল আর শেক্সপিয়ারের গ্রন্থগুলো ছাড়া এ যাবৎ আর কোনো বই-ই এত বেশি বিক্রি ও বাজার পেতে সক্ষম হয় নি। তাঁর লেখা উপন্যাস মঞ্চে এবং রুপালি পর্দায়ও দীর্ঘস্থায়ী জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

চার্লস ডিকেন্স কিন্তু চার বছরের বেশি একদিনও স্কুলে যাননি। কিন্তু তিনিই ইংরেজি ভাষায় সতেরটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন। চালর্সের বাবা-মা একটা স্কুল চালাতেন কিন্তু চার্লস কোনোদিন সে স্কুলে যান নি। এটা ছিল যুবতীদের একটা স্কুল। সামনের দরজায় পিতলের ফলকে লেখা থাকত মিসেস ডিকেন্সের প্রতিষ্ঠান। অবশ্য লন্ডনের একটা যুবতীও এখানে শিক্ষালাভ করতে আসে নি। দেনার দায়ে ডিকেন্সের বাবার জেল হয়েছিল।

ডিকেন্সের শৈশব ছিল অত্যন্ত নোংরা ও কদর্যপূর্ণ আর বিষাদময়। তার বাবা যখন জেলে গেলেন তখন তার বয়স মাত্র দশ বছর। তাদের পরিবারে খাওয়ার মতো কিছুই ছিল না। প্রতিদিনই সকালবেলা অন্নসংস্থানের জন্য বাড়ির একটা আসবাবপত্র বিক্রি করতেন বন্ধকী কারবারের দোকানে। খেয়ে বাঁচার তাগিদে তার প্রিয় দশটি বইও তাকে বিক্রি করতে হয়েছিল। বইগুলো বিক্রি করার সময় তার মনের করুণ অবস্থাটার বর্ণনা করেছেন, আমি যখন আমার বইগুলি বিক্রি করতাম, মনে হত আমার অন্তরটা বুঝি ভেঙে যাচ্ছে। অবশেষে ক্ষুৎপিপাসায় অস্থির হয়ে মা মিসেস ডিকেন্স চার্লসহ তার চার সন্তানকে নিয়ে স্বামীর সাথে জেলে বাস করতে গেলেন। প্রতিদিন সকালে চার্লস জেলখানায় যেতেন এবং পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে রাত্রিতে ফিরে এসে বাড়ির চিলেকোঠায় ঘুমোতেন। অতঃপর একটা ইঁদুরভর্তি গুদামঘরে কালো রঙের বোতল লেবেল আঁটার কাজ পেলেন তিনি। উপার্জনের প্রথম কয়েকটি পেনি দিয়ে চিলেকোঠায় একটা অন্ধকার খুপড়ির মতো ঘর ভাড়া নিলেন। ডিকেন্সের মতে এ ছোট্ট খুপড়িটাই ছিল তাঁর কাছে বেহেশত। পরবর্তীতে চার্লস তাঁর শৈশবের দৈন্যদশার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন ।একটি অবিস্মরণীয় চিত্র এঁকে।

ডিকেন্সের লেখায় ছিল সুখী-সচ্ছল গার্হস্থ্য জীবনের মূর্তমান প্রতিচ্ছবি। অথচ তার বিবাহিত জীবনটা ছিল ব্যর্থতার করুণ ইতিহাস। এমন এক স্ত্রীর সঙ্গে তিনি বসবাস করেছেন তাকে চার্লস ভালোবাসতেন না। তাঁর স্ত্রী দশটি সন্তান জন্মদান করেন, বছর বছর তাদের দুরবস্থা বাড়তে থাকে। সমস্ত পৃথিবী যখন তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল তখনো তার নিজের গৃহ ছিল নৈরাশ্যপূর্ণ। কিন্তু নিজের দুরবস্থা সহ্য করতে না পেরে চার্লস এক অভাবনীয় কাণ্ড করে বসলেন–তিনি পত্রিকায় ঘোষণা করে দিলেন যে তিনি এবং তার স্ত্রী পৃথক হয়ে গেছেন, এবং সম্পূর্ণ দোষটা স্ত্রীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। ডিকেন্স যখন মারা যান তখন তার শালিকাকে এক মিলিয়ন ডলারের এক-পঞ্চমাংশ দান করে যান কিন্তু স্ত্রীকে দিয়ে গেলেন সপ্তাহে মাত্র পঁয়ত্রিশ ডলার। ' চার্লস ডিকেন্স সমালোচনা পছন্দ করেতেন না। তিনি তার দারুণ আকর্ষণীয় চেহারা ও দৈহিক গড়নের জন্য অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন।

১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে যখন প্রথম আমেরিকায় আসেন তখন তার উজ্জ্বল লাল রঙের ওয়েস্টকোট হালকা নীল রংয়ের ওভারকোট গায়ে দিয়ে সকলের চোখ ধাধিয়ে দিয়েছিলেন। চার্লস ডিকেন্স ছিলেন তার সময়কার সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনি যখন আমেরিকায় আসেন তখন তাকে দেখার জন্য দলে দলে লোক ঠাণ্ডা বাতাসে হাঁড়কাঁপানো শীতে কাঁপতে কাঁপতে টিকেট কাটার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল। ব্রুকলিনে লোকজন তুষারপাত ও নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও প্রত্যেক দিন তার কথা শোনার সুযোগলাভের জন্যে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে সমস্ত রাত রাস্তায় মাদুর বিছিয়ে শুয়েছিল। আর যখন টিকেট বিক্রি শেষ হয়ে গেল, তার ভক্তরা তাকে দেখার জন্য মারামারি বাধিয়ে দিল। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাস বহু চরিত্রে পরিপূর্ণ, কিন্তু সর্বাদিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে চার্লস ডিকেন্সই ছিলেন সর্বাধিক বিস্ময়কর ও জনপ্রিয়।

জন ডি. রকফেলার : যার ধন সম্পদ এখনো বেড়ে চলেছে

জন ডি. রকফেলার, যিনি বিশ্বের ইতিহাসে সম্ভবত সর্বাধিক ধনসম্পদের মালিক হয়েছিলেন।

প্রথম জীবনে রকফেলার যখন ঘণ্টায় মাত্র চার সেন্টের বিনিময়ে কাঠফাটা রোদের নিচে আলু ক্ষেতে লোহার কোদাল নিয়ে কাজ করেছেন, তখন যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবেরের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা কয়েকজন। জন ডি, রকফেলার তাঁর অপরিসীম অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে দুই বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন।

রকফেলার তাঁর মাকে হাঁস-মুরগি পালনে সাহায্য করে তাঁর জীবনের প্রথম ডলারটি উপার্জন করেছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত তাঁর সুবিশাল আট হাজার একর জমিতে চমৎকার এক পাল মুরগি পুষতেন যেগুলো দেখে তিনি তাঁর শৈশবস্মৃতি মনে করতেন।

রকফেলারকে তার মা মুরগি পোষার জন্য যে অর্থ দিতেন তা তিনি খরচ না করে একটা ফাটা অব্যবহৃত চায়ের পেয়ালায় জমাতেন। এ ছাড়াও দিনে ৩৭ সেন্টের বিনিময়ে এক কৃষিখামারে কাজ করতেন। প্রথম অবস্থায় ৫০ ডলার না হওয়া পর্যন্ত তিনি পুরো পারিশ্রমিকটাকেই জমা করতেন। এরপর ওই ৫০টি ডলার শতকরা ৭ ডলার সুদে তার নিয়োগকর্তাকেই ধার দিলেন। তিনি দেখলেন যে দশ দিন কঠোর শ্রম দিয়ে তিনি যে

পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারেন, ঐ বিনিয়োগকৃত পঞ্চাশ ডলার তার জন্য এক বছরে সমপরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম। তিনি বলেছেন, ‘আমি নিজে টাকার দাস না হয়ে টাকাকেই আমার দাস বানাব।’

প্রথম জীবনে রকফেলার যে মেয়েটির প্রেমে পড়েছিলেন সে মেয়েটি তাঁকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেছিল। মেয়েটির মা বলেছিলেন, ‘রকফেলারের মতো একজন স্বল্প আয়সম্পন্ন মানুষ যার উন্নতির আশা অত্যন্ত ক্ষীণ, তার হাতে সঁপে দিয়ে আমার মেয়েকে জলে ভাসিয়ে দিতে পারি না।‘ অথচ এই লোকটিই পরবর্তীকালে আমেরিকার বিখ্যাত ধনকুবের উলওয়ার্থ, ডিউক ও হ্যারিম্যান একত্রে যত অর্থ সম্পদ উপার্জন করেছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ সম্পদ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রকফেলার কখনো কলেজে পড়েন নি। স্কুল জীবন শেষ করে কয়েক মাসের জন্য একটি বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেছেন মাত্র। ষোল বছর বয়সেই বিদ্যায়তনে শিক্ষা গ্রহণ শেষ হয়ে যায়।

অথচ তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ কোটি ডলার দান করেছেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধীরস্থির ও শান্তপ্রকৃতির মানুষ, কখনো উত্তেজিত হতেন না কিংবা তাড়াহুড়ো করতেন না। যখন তিনি স্ট্যান্ডার্ড ওয়েল কোম্পানির প্রধান ছিলেন, তার অফিসে প্রতিদিন দুপুরবেলা একটি নির্ধারিত কাউচে আধঘণ্টা ঘুমাতেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রতিদিন এমনি একটু একটু করে পাঁচবার ঘুমানোর অভ্যেস ছিল তাঁর।

রকফেলারের বয়স যখন পঞ্চান্ন তখন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার বিষয়টি চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির ক্ষেত্রে একটি অন্যতম কাজ হয়েছিল। কারণ নিজের অসুস্থতাজনিত ব্যাপারে রকফেলার চিকিৎসাবিজ্ঞানে গবেষণার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দান করে উৎসাহিত করেছিলেন। এর ফলে গঠিত হয়েছে 'রকফেলার ফাউন্ডেশন' যা সারা বিশ্বজুড়ে মানবস্বাস্থ্যের উন্নয়ন কল্পে প্রতি মাসে দশ লক্ষ ডলার দান করে থাকে।

রকফেলারের জীবনের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, তিনি ৭৫,০০,০০,০০০ ডলার দান করেছিলেন। বিশ্বের ইতিহাসে আর কোনো লোক এত অর্থ দান করেন নি।

তিনি গির্জার ব্যাপারে গভীর উৎসাহী ছিলেন। কখনো নাচতেন না, থিয়েটারে যেতেন না এবং ধূমপান বা মদ্যপান করতেন না। প্রতিবার খাদ্যগ্রহণের আগে তিনি প্রার্থনা করতেন এবং প্রতিদিনই বাইবেল পাঠ শুনতেন। এতদিন তিনি উন্নত জীবনের গান এবং কবিতা পাঠ শুনতেন।

রকফেলারের ধনসম্পদ এখনো গড়ে প্রতি মিনিটে বেড়ে চলেছে প্রায় একশ' ডলার করে; তবু তাঁর জীবনের একমাত্র উচ্চাভিলাষ ছিল একশত বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকার। তিনি বলেছিলেন যে, যদি তিনি ১৯৩৯ সালের ৮ই জুলাই তার শততম জন্ম বার্ষিকী পর্যন্ত জীবিত থাকেন, তাহলে পোকান্টিকো হিলস-এ অনুষ্ঠিতব্য সেই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটিতে তিনি ব্যান্ডদল পরিচালনা করবেন। আর যে বাজনাটা বাজাবেন তা হল ম্যাগি, তুমি এবং যখন আমি তরুণ ছিলাম।

জে. পি. মর্গান : একজন বিশিষ্ট ধনকুবের, যিনি ছিলেন অখ্যাত ও রহস্যময়

ঘটনাটি ঘটেছিল দুপুর বারোটা এক মিনিটে। তখন লোকজনের অফিস-আদালত থেকে বাড়ি যাবার পালা। সদর রাস্তার এক প্রাসাদের বিপরীত দিকে একটা পুরানো ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল। গাড়িটা কারো মনোযোগ আকর্ষণ করে নি। হঠাৎ একটা সবুজ রংয়ের চোখ ঝলসানো আলোর ঝিলিক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর একটা দমকা বাতাসের সাথে সাথে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটল। ১০০ পাউন্ডের একটি টি.এন.টি. বোমা বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হতেই অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল–বিশাল বিশাল ভবনগুলির ভীত নড়ে উঠল, জানলাগুলি ভেঙে টুকরো হয়ে গেল, কোথাও দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। রাস্তার প্রায় ত্রিশ ফুট উপরে জানালার ভিতর দিয়ে মানুষের হাত, পা মাথা ও ধড় নিক্ষিপ্ত হয়ে দেয়ালের গায়ে তাকের উপর পড়তে থাকল আর রক্তাক্ত দেহের পঙ্গু মানুষগুলো কাতরাতে কাতরাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। অ্যাম্বুলেন্সের চিৎকার আর দমকলবাহিনীর সাইরেন সব মিলিয়ে ঘটনার বিভীষিকা আরো বাড়িয়ে দিল।

যখন সব শান্ত হল, দেখা গেল, যে ঘোড়ার গাড়িতে করে বোমা আনা হয়েছে তার চাকার একটি টুকরো, কয়েকটি স্তু ও কজা এবং ঘোড়ার খুরের দুটো নাল ছাড়া আর কিছুই সেখানে অবশিষ্ট নেই। কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে এ ঘটনা ঘটে গেল সেই জে. পিয়ারপন্ট মার্গান তখন ইউরোপে। মর্গান ঠিক করলেন এ বর্বর কাপুরুষোচিত ঘটনার রহস্য উদঘাটন করবেনই। এজন্য পঞ্চাশ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হল। পুলিশবাহিনী, ফেডারেল

এজেন্ট, সিক্রেট সার্ভিস, প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিয়োগ করে অভিযান শুরু করা হল। সমস্ত পৃথিবী তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল, কিন্তু সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। তারপর বহু বছর গত হয়ে গেছে কিন্তু আজো সেই রহস্য রহস্যই রয়ে গেছে।

জে. পিয়ারপন্ট মার্গনকে বলা হত অর্থ সম্পদের জগতে সবচেয়ে শক্তিধর ব্যক্তি। কিন্তু ওয়াল স্ট্রিটের ডিক্টেটর মর্গান ছিলেন একজন অখ্যাত ও রহস্যময় লোক। তিনি সবসময় প্রচার এড়িয়ে চলতেন এবং ফটোগ্রাফারদের ভয়ে আতঙ্কিত থাকতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী ব্যক্তিত্ব। তাই কখনো কখনো তাকে 'আমেরিকার সবচেয়ে অকূটনীতিজ্ঞ' বলা হত।

মর্গানের ওজন ছিল ২০০ পাউন্ড আর উচ্চতা ছিল ছয় ফুট। অত্যন্ত নির্ভীক ছিলেন তিনি। একদিন এক পাগল তার বাড়িতে ঢুকে তাকে পিস্তল বাগিয়ে হত্যা করতে উদ্যত হল। মর্গান ইচ্ছে করলে পালাতে পারতেন। তা না করে তিনি সরাসরি লোকটার দিকে এগোতে থাকলেন, লোকটা তার তলপেটে গুলি করল।

তিনি তবুও দমলেন না বরং সরাসরি এগিয়ে এসে লোকটার হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন। বলা বাহুল্য তিনি সেবার বেঁচে গিয়েছিলেন।

একজন কোটিপতি হওয়া সত্ত্বেও জে.পি. মর্গানের জীবনটা অত্যন্ত সাদাসিধে ভাবেই কেটেছে। তিনি একটি হ্যাটকোট পরে চোখে-মুখে বৃষ্টির ঝাপটা লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসতেন।

জ্যাক লন্ডন : যাঁর আয় ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের আয়ের দ্বিগুণ

এই ব্যক্তিটি হলেন জ্যাক লন্ডন যিনি ‘দ্য কল অব দ্য ওয়াইলন্ড’ উপন্যাস লিখে রাতারাতি বিখ্যাত হয়েছিলেন। একসময় তিনি একটি মালগাড়ির রডে চড়ে বাফেলোতে প্রবেশ করলেন এবং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করতে লাগলেন। একজন পুলিশ ভবঘুরেপনার জন্য তাকে গ্রেপ্তার করে এবং তিরিশ দিনের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

মাত্র ছয় বছর পর এই ভবঘুরে ভিক্ষুক ব্যক্তি একজন সবচেয়ে জরুরি ব্যক্তি হয়ে গেলেন। ক্যালিফোর্নিয়ার সেরা ব্যক্তিরা তাকে আপ্যায়ন করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন এবং তিনি একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, সমালোচক হিসেবে খ্যাতির উজ্জ্বলতম নক্ষত্ররূপে সমাদৃত হলেন। তিনি উনিশ বছর বয়সে মাত্র তিন মাসের জন্য স্কুলে যান আর মৃত্যুর আগে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে একান্নটি উপন্যাস লিখে রেখে গেলেন। তার লেখা ‘দ্য কল অব দ্য ওয়াইল্ড’ থেকে হলিউডের চিত্র নির্মাতারা লক্ষ লক্ষ ডলার উপার্জন করেছেন কিন্তু তিনি বইটির সর্বস্বত্ব বিক্রি করে পেলেন মাত্র দু’হাজার ডলার।

তিনি পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি জায়গায় যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং তার ভ্রমণ কাহিনী সংবলিত একটা বইও লিখে গেছেন। তিনি ছিলেন মাস্তুলের সামনে দাঁড়ান নাবিক, জাহাজের খালাসি, ঝিনুক লুণ্ঠনকারী পাইরেট এবং স্বর্ণখনির শ্রমিক। তাকে প্রায়ই না খেয়ে থাকতে হত, পার্কের বেঞ্চিতে কিংবা খড়ের গাদায় ঘুমুতেন। কখনো-কখনো

তিনি এত ক্লান্ত থাকতেন যে মালগাড়ির রডের ওপর বসে থাকতে থাকতে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়তেন। আমেরিকায় তাকে শতবার জেলে পোরা হয়েছে, মেক্সিকো, মাঞ্চুরিয়া, জাপান ও কোরিয়ার জেলে বিভিন্ন সময়ে আটক রাখা হয়েছে।

দরিদ্র এবং দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হয়ে সানফ্রান্সিসকো উপসাগরের উপকূলে গুণ্ডা দলের সঙ্গে মিশে গুণ্ডামি করতেন। একদিন তিনি এক পাবলিক লাইব্রেরিতে ঢুকে পড়ে রবিনসন ক্রুশো পড়া শুরু করে দিলেন এবং পড়ে মুগ্ধ হলেন। তার খুব ক্ষিদে পেল কিন্তু তবুও দৌড়ে বাড়ি গিয়ে খাবার খেয়ে আসার জন্যও পড়া থামালেন না। পরদিন তিনি আবার লাইব্রেরিতে গেলেন, তার পড়ার ঝোঁক বেড়ে গেল এবং একের পর এক বই শেষ করতে লাগলেন তিনি। তার চোখের সামনে আরব্য উপন্যাসের বিচিত্র রজনীর মতো বিশাল সাহিত্যাঙ্গনের দরজা খুলে গিয়ে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। তিনি প্রতিদিন দশ থেকে পনের ঘণ্টা বই নিয়ে জ্ঞানের সাগরে অবগাহন করতে লাগলেন। তিনি পেশী বিক্রি বন্ধ করে দিয়ে মস্তিষ্ক বিক্রি করতে মনস্থ করলেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যান্ডে এক স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলেন জ্যাক লন্ডন। দিনরাত পড়তে লাগলেন, ঘুমানো প্রায় ছেড়ে দিলেন এবং একটা অসম্ভব ব্যাপার ঘটিয়ে ছাড়লেন। সেটা হল-তিনি চার বছরের পড়া মাত্র তিন মাসে পড়ে শিখে ফেললেন এবং সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। একজন বড় লেখক হবার অদম্য প্রেরণায় তিনি বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিকদের রচনাগুলো বারবার পড়তে লাগলেন। অবশেষে দিনে পাঁচ হাজার শব্দ করে লিখতে শুরু করলেন। তারপর একদিন 'সানফ্রান্সিসকো কল' আয়োজিত এক প্রতিযোগিতায় তার 'টাইফুন অব দ্য কোস্ট অব জাপান' গল্পটি প্রথম পুরস্কার পেল।

ক্লনভাইকে স্বর্ণের অন্বেষণে তিনি একটা বিরামহীন উত্তেজনাপূর্ণ বছর অতিবাহিত করলেন। তবে অসম্ভব দুর্ভিক্ষ ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় দিনের পর দিন কাটাতে হয়েছিল। তারপর একদিন যখন তার ও অনশনের মধ্যে ব্যাবধান মাত্র দু'ডলার, তখন চিরকালের জন্য কায়িক শ্রম ছেড়ে দিয়ে সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। এটা হল ১৮৯৮ সালের ঘটনা। ১৯০৩ সালের মধ্যে তিনি দু'টি বই এবং পঁচিশটি ছোটগল্প প্রকাশ করে আমেরিকার প্রকাশনা ও সাহিত্য জগতে একজন অন্যতম প্রধান আলোচিত ব্যক্তিত্বে পরিগণিত হলেন। সাহিত্যচর্চার শুরু করার মাত্র আঠারো বছর পর জ্যাক লন্ডন পরলোক গমন করেন।

তিনি বছরে গড়ে প্রায় তিনটি বই রচনা করেন। তার বার্ষিক আয় ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের আয়ের দ্বিগুণ। তার বইগুলো এখনো অত্যন্ত জনপ্রিয়। আমেরিকার সাহিত্যাঙ্গনে এখনো জ্যাক লন্ডন একজন প্রথিতযশা লেখক হিসেবে সমধিক পরিচিত।

ডায়মন্ড জিম ব্রেডি : একজনের জন্য এক মিলিয়ন ডলার দিতে চেয়েছিলেন

ব্রডওয়ের হারুন-আল-রশীদ নামে খ্যাত ডায়মন্ড জিম ব্রেডি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মারা যান এবং তার মৃত্যু 'গ্রেট হোয়াইট ওয়ে'র কাছ থেকে এক অবিশ্বাস্য ঘটনার জন্ম দিয়েছিল। জিম ব্রেডি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন অত্যন্ত জমকালো ও আকর্ষণীয় ভোজসভার আয়োজন করত পছন্দ করতেন। প্রাচীন রোমসম্রাটরা যখন নাইটিংগেলে জিভ দিয়ে খাবার খেতেন। তারপর থেকে এই পৃথিবী এমন প্রাচীণ ভোজসভা আর দেখে নি। কখনো-কখনো তিনি শহরের বিভিন্ন স্থানে একসঙ্গে পাঁচটি ভোজসভার আয়োজন করেছেন। তার ভোজসভাগুলো মহা আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে সারাদিনমান ধরে চলতে থাকত। এতে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ হয়ে যেত। তিনি ভোজসভায় বন্ধু-বান্ধবদের ও অতিথিদেরকে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ হীরের ব্রোচ, হীরের ঘড়ি ইত্যাদি মূল্যবান জিনিস উপহার দিতে ভালবাসতেন যেগুলোর এক একটির দাম ছিল প্রায় একহাজার ডলার।

ডায়মন্ড জিম ব্রেডি ব্রডওয়ের একটা সেলুনের ওপর এক ফ্লাটে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার বাবা সেলুনটা চালাতেন। জিম ব্রেডি জীবনে কোনোদিন একফোঁটাও মদ পান করেন নি কিন্তু তিনি যখন ব্রডওয়ের সবচেয়ে গৌরবজনক আসনে আসীন তখন মদের পেছনে শত শত ডলার ব্যয় করে বন্ধু বান্ধবদের উপহার দিয়েছেন। তার বন্ধুরা যখন মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে যেত তিনি তাদের পাশে বসে সামান্য রুটি বিয়ার চুমুক দিয়ে পিপাসা নিবৃত্ত করতেন। তিনি প্রতিদিন প্রায় পনের প্রকার খাবার দিয়ে ডিনার করতেন; এগুলোর সাথে

আরো ছোটখাটো দু'তিন পদও থাকত। ডিনার শেষে তিনি এক পাউন্ড চকোলেট খেতেনএবং এক বাক্স পেপারমিন্ট নিয়ে থিয়েটারে যেতেন। প্রতি সপ্তায় জিমতার বন্ধুদের কাছে মিষ্টির বাক্স পাঠাতেন আর তাতে তার গড়ে দু'তিন হাজার ডলার বিল উঠত। তিনি নিজেও ভোজন রসিক ছিলেন। তিনি চা ও কফি পছন্দ করতেন না এবং কমলার রস অত্যন্ত ভালবাসতেন। একবার তিনি এক বসায় ছয়টা মুরগি খেয়ে সাবাড় করেছেন। ব্যাপারটা আজগুবি মনে হতে পারে কিন্তু বৃদ্ধবয়সে তার পেট অপারেশন করে ডাক্তারটা দেখলেন যেন তার পাকস্থলী সাধারণ পকস্থলীর চেয়ে ছয় গুণ বড়।

যে লোকটি জমকালো ভোজসভার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ডলার উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি কিন্তু কীভাবে লক্ষ লক্ষ ডলার উপার্জন করেছিলেন তা আপনার জিজ্ঞাস থাকতে পারে। তিনি ছিলেন একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ দক্ষ বিক্রেতা। তা ছাড়া তার ভাগ্যদেবী ছিল তার প্রতি অত্যন্ত সুপ্রসন্ন। তখন রেলপথে যখন কাঠের রেলগাড়ি চলতু তিনি তখন স্টিলের রেলগাড়ি তৈরি করে বিক্রি করা আরম্ভ করেন। কিন্তু এগুলো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে ছিল বলে কেউ তা চাইত না। অবশেষে চুক্তিসাপেক্ষে প্রতিটা গাড়ি বিক্রি করার জন্য তিনি এক তৃতীয়াংশেরও অনেক বেশি সম্মান পান। এরপর স্টিলের গাড়ির চাহিদা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পেল। আর জিমও কামাতে লাগলেন অগণিত ডলার।

একটা চমকপ্রদ ও অদ্ভুত প্রচারণার দ্বারা ডায়মন্ড জিম স্কোহেগান থেকে সান্তা ফে পর্যন্ত নিজেকে বিখ্যাত করে ফেললেন। বলতে গেলে, তিনি নিজেকে হীরক দ্বারা ভূষিত করলেন। তিনি প্রতিদিন নতুন নতুন অলঙ্কার পরতেন, এমনকি প্রায় দিনে ছ'সাতবার অলঙ্কার পাল্টাতেন। তিনি দু'হাজার পাঁচশ আটচল্লিশটি ঝকঝকে ও মূল্যবান হীরক এবং উনচল্লিশটি চুনি বসানো জমকালো পোশাক পরে ব্রডওয়েতে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি

বাইসাইকেল ও মোটরগাড়ির প্রতীক বিশিষ্ট জামার বোতাম এবং রেলগাড়ি ইঞ্জিনের প্রতীক বিশিষ্ট কাফলিঙ্ক পরতেন।

জিম ব্রেডি ছিলেন ভীষণ অমিতব্যয়ী। নিউজার্সিতে তার একটা খামার ছিল। সেখানে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে গাভীর দুধ দোহানো হত পুরো সোনার বালতিতে করে। তার বিলিয়ার্ড টেবিলটা ছিল মহা মূল্যবান পাথর খচিত। তার বাড়ির সাজসজ্জা সম্পন্ন করার জন্য এক ডেকোরেটরকে তিনি সোয়া তিন লক্ষ ডলারেরও বেশি পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন। আরো মজার ব্যাপার হল, তিনি প্রতি বছর তার সমস্ত আসবাবপত্র বন্ধুবান্ধবদের দিয়ে দিতেন এবং নতুন করে আরো মূল্যবান আসবাবপত্র কিনতেন। রাসেলকে সোনার আস্তরণ করা এবং শত শত হীরা-চুরিন্ন-পান্না ও অন্যান্য মণিমুক্তা খচিত একটি বাইসাইকেল উপহার দিয়েছিলেন। আর যখন লিয়িয়ান ঐ বাইসাইকেলে চড়ে ফিফথ এভিনিউতে গেলেন তাকে দেখার জন্য লোক জমে গিয়েছিলেন। অবশেষে ট্রাফিকের ঠেলা সমালানোই দায় হয়ে উঠল।

জিমের পাঁচ হাজার সুন্দর রুমাল এবং দুশ প্রস্থ পোশাক ছিল। তিনি কখনো তার প্রিয় প্রিন্স এলবার্ট ও লম্বা সিল্কের হ্যাট না পরে লোকজনের সামনে যেতেন না। তার পাকস্থলীটা ছিল যেমন ছয়গুণ বড়, হৃদয়টাও ছিল তেমনি। কেউ তার কাছে এসে দুর্ভাগ্যের ইতিহাস শোনালে তিনি জানতেন যে, এর অধিকাংশই কখনো তিনি ফেরত পাবেন না। তিনি যখন বুঝলেন যে তার মৃত্যু আসন্ন তখন দেখলেন, তার কাছে দু'লক্ষ ডলারের মতো ঋণ স্বীকারপত্র পড়ে রয়েছে তখন সেগুলো পুড়িয়ে দেওয়াই অন্তিম কাজ বলে মনে করলেন। তিনি বলেন, আমার যদি মরণ থাকে মরে যাব। কিন্তু কারো জন্য দুঃখ কষ্ট ও মনস্তাপ রেখে যাবো না।

তিনি যখন মারা যান তখন মূলত তার বিশাল ধনৈশ্বর্যের সবটাই দান করে যান। প্রত্যেকে ডায়মন্ড জিমকে অত্যন্ত ভালবাসত কিন্তু তিনি সারাজীবন কুমার হয়েই রয়ে গেলেন। তিনি লিলিয়ান রাসেলের কোলে এক মিলিয়ন ডলার রেখে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু লিলিয়ান তা প্রত্যাখ্যান করলেন। একবার তিনি বলেছিলেন, 'আমার মতো কুৎসিত চেহারার লোককে দুনিয়ার কোনো মেয়েই বিয়ে করতে চাইবে না। তারপর টেবিলে মাথা রেখে তিনি শিশুর মতো কাঁদলেন।

থিয়োডর রুজভেল্ট : বুকে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরেও বক্তৃতা থামান নি

আমেরিকার সবচেয়ে সুদর্শন এবং বর্ণাঢ্য প্রেসিডেন্ট ছিলেন থিয়োডর রুজভেল্ট। ছোটবেলায় তিনি ছিলেন হাঁপানি রুগী। স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য তিনি পশ্চিমে গেলেন। সেখানে তিনি রাখাল হলেন, খোলা আকাশের নিচে ঘুমোলেন। তারপর তিনি সুস্বাস্থ্য ফিরে গেলেন, পরে দেখা গেল তাকে মাইক ডোনাভনের সাথে বক্সিং লড়ছেন। তিনি দক্ষিণ আমেরিকার বনাঞ্চল আবিষ্কার করেছেন এবং তিনি সর্বকালের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত বড় জন্তু শিকারী ছিলেন।

রুজভেল্ট তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে তিনি শৈশবে দুর্বল স্নায়ুবিশিষ্ট ও ভীরু প্রকৃতির ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। তিনি হাত ভেঙেছিলেন, বুকের পাঁজর ভেঙেছিলেন, কাঁধ ভেঙেছিলেন তবু ঝুঁকি নেয়া বন্ধ করেন নি। তিনি বলেছেন, যে সব কাজ করতে তার ভয় হত তা তিনি আরো বেশি করতেন এবং সে সব কাজ করতে গিয়ে খুব সাহস দেখালেও ভেতরে ভেতরে ভীতু ছিলেন শেষপর্যন্ত এত সাহসী হয়ে উঠলেন যে ক্রুদ্ধ সিংহ বা গর্জনশীল কামান কোনো কিছুতেই ভয় পেতেন না। ১৯১২ সালে বুলমোস অভিযানকালে রুজভেল্ট যখন এক জায়গায় বক্তৃতা দিতে যাচ্ছিলেন তখন এক অর্ধপাগল ব্যক্তি তার বুকে গুলি করল। তিনি কাউকে বুঝতে দিলেন না তার বুকে বুলেটটা লেগেছে। তিনি সোজাসুজি আডিটরিয়ামে গিয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিলেন এবং যতক্ষণ না সংজ্ঞাহীন হলেন ততক্ষণ বক্তৃতা দিয়ে যেতে থাকলেন।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন একসময় রুজভেল্ট এক আর্মি অফিসারের সাথে বক্সিং লড়েছেন। এতে ঘুষি খেয়ে রুজভেল্ট তার বাম চোখে মারাত্মক আঘাত প্রাপ্ত হলেন। বেশ কয়েক বছর পর তিনি চিরদিনের জন্য ঐ চোখের দৃশিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু তিনি ওই গোলন্দাজ অফিসারকে জানতেই দিলেন না তার কী ক্ষতি সে করেছে।

তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। ওয়েস্টার বে'তে তার জমিদারি এলাকায় রুজভেল্ট একসময় খামারের মজুরদের সাথে কাট চিড়তেন, ফসল তদারক করতেন এবং মজুরদের মতো তাকেও একই পরিমাণ বেতন দেয়ার জন্য তিনি পীড়াপীড়ি করতেন। কখনো ধূমপান করেন নি, মদ্যপান বলতে দুধের সাথে কালেভদ্রে এক চামচ ব্রান্ডি মিশিয়ে খেতেন।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়ে হোয়াইট হাউসে থাকাকালে তাকে অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটাতে হত অবশ্যই। কিন্তু এর মধ্যেই তিনি শতশত বইয়ের পাতা উল্টিয়েছেন। তার হাতে সব সময়ই একটা বই থাকত। একজন সাক্ষাৎপ্রার্থী যাওয়ার পর অন্যজন আসার ফাঁকে যে-কয়েক সেকেন্ড বা মিনিট সময় পেতেন, বইয়ের পাতা ওল্টাতেন। একদিন তিনি ডাকোটায় পশু চরাচ্ছিলেন, তখন এক রাখালকে সম্পূর্ণ হ্যামলেটটা পড়ে শোনান। তিনি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু নিজে সুর মেলাতে পারতেন না। একবার তিনি পশ্চিমের এক শহরের ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে যাবার সময় টুপি কাত করে ধরেছিলেন এবং উৎফুল্ল জনতার উদ্দেশ্যে প্রভু তোমার আরো কাছে গানটা গেয়েছিলেন।

অনেকরকম সখ ছিল রুজভেল্টের। মজার একটা ঘটনা শুনুন, হোয়াইট হাউসে থাকাকালে হঠাৎ করে একদিন ওয়াশিংটনের নামজাদা সাংবাদিককে তার সাক্ষাৎকারের জন্য

আসতেন বললেন। সাংবাদিক উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠল, ভাবল, রুজভেল্ট বুঝি তাকে কোনো রাষ্ট্রীয় সাক্ষাৎকার দান করবেন। সে পত্রিকার খবরটি ছাপার জন্য কলাম খালি রেখে তৈরি থাকতে নির্দেশ দিয়েই রুজভেল্টের কাছে ছুটল। যখন সে হোয়াইট হাউসে পৌঁছল, রুজভেল্ট তাকে একটা রাজনীতির কথাও বললেন না। তিনি ওই সাংবাদিককে হোয়াইট হাউসের বাইরে এক গাছতলায় নিয়ে এলেন এবং তাকে নিজের আবিষ্কৃত কতকগুলো বাচ্চাওয়ালা পেঁচার বাসা দেখিয়ে দিলেন।

আমেরিকার সফল প্রেসিডেন্ট ছিলেন থিয়োডর রুজভেল্ট। তিনি তার জনগণকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। ১৯১৯ সানের ৪ঠা জানুয়ারি ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তার শেষ উচ্চারিত কথাগুলো হল অনুগ্রহপূর্বক বাতিগুলো নিভিয়ে দিন।

ফ্রান্সিস ইয়েটস ব্রাউন : যিনি তাঁর জীবনে অনেকগুলো জীবনযাপন করেছেন

বিশ বছর আগে এক সোনালি বিকেলে ফ্রান্সিস ইয়েটস ব্রাউন নামক এক পাতলা গড়নের যুবক ফরেস্ট হিলসে আমার মুখোমুখি বসেছিলেন এবং প্রাচ্যের রহস্যময় কিংবদন্তির দেশগুলোতে তার দুঃসাহসিক ভ্রমণের কাহিনী শুনিয়ে আমাকে হতবাক করে দিয়েছিলেন। উনিশ বছর বয়স থেকে তিনি অনেক মৃত্যু দেখেছিলেন। তিনি মেসোপটেমিয়ার উত্তপ্ত মরুভূমিতে তুর্কিবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন এবং ফেডার্সের জলাভূমিতে জার্মানদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। বাগদাদ ও কনস্টান্টিনোপলে তিনি যুদ্ধবন্দি ছিলেন। 'দ্য ব্লাডি ইয়ারস' নামে তার রচিত এক গ্রন্থের মাধ্যমে তার যুদ্ধের চেয়ে কবিতা ও দর্শনপ্রিয়তা প্রকাশ পেয়েছিল।

বিশ বছরের সৈনিক জীবনে ফ্রান্সিস ব্রাউন সামান্যই সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন। তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। তিনি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের কাছে লেখাপড়া করেছেন এবং অতিন্দ্রিয়বাদের শিষ্য হয়েছেন।

আমাদের সবার মতো তিনি একটা জীবনযাপন করেন নি। তার ঊনচল্লিশ বছরের জীবনে তিনি অনেকগুলো জীবনযাপন করেছেন। শেষপর্যায়ে তিনি যখন তার কর্মচাঞ্চল্যময় জীবন কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন তাতে তিনি আমার কাছে বলা অনেক ঘটনা সন্নিবেশিত করেছেন। বইটার নাম দিয়েছেন তিনি 'দ্য লাইভস্ অব বেঙ্গল ল্যান্সার।' ১৯৩০-এর সময়ে বইটা

এক যুগান্তকার আলোড়ন সৃষ্টি করে তার সাফল্য এনে দিয়েছিল। এ বই অবলম্বনে হলিউডে চিত্তাকর্ষক ছবি তৈরি হয়েছিল পরবর্তীকালে। ব্রাইন মাত্র উনিশ বছ বয়সে রয়্যাল বেঙ্গল ল্যান্সার বাহিনীর পোশাক পরেন। ব্রিটিশবাহিনীর এটাই ছিল সর্বাপেক্ষা অভিজাত ও গর্বিত অশ্বারোহী বাহিনী। এ বাহিনীতে যোগদান করে ব্রাউন ভারত উপমহাদেশসহ প্রাচ্যের অনেক ঐতিহাসিক স্থানে ভ্রমণের সুযোগ লাভ করছেন।

প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় তিনি শয্যা ত্যাগ করতেন এবং সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত ড্রিল করতেন। তিনি বলেছেন, ভারতবর্ষের সবচেয়ে দুঃসাহসিক ও উত্তেজনাপূর্ণ অভিযানে শূকর শিকারে অংশগ্রহণ করতেন। পৃথিবীর কোনো প্রাণীই আহত বুনো শুকরের মতো বদমেজাজি নয়। কেশয়ালের মতো চাতুর্য, সিংহের মতো সাহস, বাঘের হিংস্রতা এবং অশ্বের ক্ষিপ্রতা এসবের সমন্বয় হল একটি আহত বুনো শূকর। ব্রাউন একটা শূকর শিকারের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন-একদিন শিকারের সময় কাঁটাময় ঝোঁপঝাড় মাড়িয়ে একটা প্রকাণ্ড শূকর বের করলেন। বর্বর শূকরটা মাঠের মাঝখান দিয়ে ছুটতে শুরু করল। তার বড় বড় দাঁতগুলো সূর্যকিরণে ঝকমক করছিল, ব্রাউন ঘোড়া নিয়ে তার পেছনে ছুটতে লাগলেন। তার বর্শা শূকরটাকে বিদ্ধ করার সাথে সাথেই ঘোড়াটা হোঁচট খেয়ে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তাকে নিয়ে। তিনি ঘোড়ার নিচে আটকা পড়লেন। বর্শাবিদ্ধ শূকরটা উঠে দাঁড়াবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। শুকরটা উঠে দাঁড়িয়েই প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সরাসরি ব্রাউনকে আক্রমণ করল। তিনি বুঝতে পারলেন নিজের করুণ পরিণতি। অনেক কষ্টে ঘোড়ার নিচ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি এক গাছে উঠে পড়লেন। শূকরটা নিরুপায় হয়ে কাতরাতে কাতরাতে মৃত্যুর হিমশীতল কোলে ঢলে পড়ল।

ফ্রান্সিস ব্রাউন অদ্ভুতভবে স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারতেন। তুর্কিদের বন্দিখানা থেকে তিনি যখন পালালেন, তুর্কিবাহিনী তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজল, এমনকি তার মাথার জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করল। তুর্কিরা তাকে যখন খুঁজছিল তখন ব্রাউন এক জার্মান গভর্নেসের ছদ্মবেশ ধারণ করে বিচিত্র পোশাক পরিধান করে এক রাশান প্রিন্সের সাথে এক ক্যাফেতে প্রেমাভিনয়ে রত। এতে তুর্কি গোয়েন্দাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক হল না বরং তারা হ্যাট খুলে মাথা নুইয়ে সুন্দরী গভর্নেসটিকে অভিবাদন জানাল। এই ছদ্মবেশে তুর্কিবাহিনীর চোখ এড়িয়ে তিনি তুরস্ক থেকে পালাতে ব্যর্থ হয়ে রাতারাতি লিঙ্গ ও জাতীয়তা পরিবর্তন করে গোলাবারুদের কারখানার কারিগরের ছদ্মবেশ ধারণ করলেন, শেষপর্যন্ত ধারণ করলেন এক কৌতুকাভিনেতার, তাতেও শেষরক্ষা হল না। আবার তিনি গ্রেফতার হলেন এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। সেখানে কারাগারের বাগানে যে সব গ্রিকরা নৈশভোজ করত, তাদের ছদ্মবেশে আবার সুচতুরভাবে দক্ষ অভিনেতার মতো কারাগার থেকে পালাতে সক্ষম হলেন। ফ্রান্সিক ইয়েটস ব্রাউনকে তার যোদ্ধা জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অধ্যায়ের বর্ণনা করতে বলায় তিনি জানান, যুদ্ধবন্দি অবস্থায় তুর্কিরা তাদের দু'শ মাইল দূরে এক ক্যাম্পে মার্চ করে যেতে বাধ্য করে। পথে তিনি এমন একটা শহরের মাঝখান দিয়ে গেলেন যেখানে এক জন লোকও জীবিত ছিল না। তুর্কিবাহিনী একটা মার্কিন পল্লীর সবাইকে হত্যা করেছিল। সেখানে সর্বত্র মৃত্যুর হিমশীতল নীরবতা বিরাজমান। শুধু জীবিত ছিল কয়েকটা কুকুর ও বাজপাখি। কুকুরগুলো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর বাজপাখিগুলো শহরটির উপরে আকাশে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল।

ফ্লোরেঞ্জ জিগফেল্ড : ইতিহাসের যে-কোনো ব্যক্তির চেয়ে তিনি অধিক সংখ্যক

ইতিহাসের যে-কোনো জীবিত লোকের চেয়ে ফ্লোরেঞ্জ জিগফেল্ড সর্বাধিক সুন্দরী মেয়ের টেলিফোন নম্বর জানতেন। তার ব্লু বুক অব বিউটিতে হাজারো মোহময়ী ও আকর্ষণীয়া সুন্দরীর নাম ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর লেখা ছিল।

জিগফেল্ডকে ‘আমেরিকান তরুণীদের গৌরব বর্ধনকারী’ বলে অভিহিত করা হলে তিনি গর্ববোধ করতেন। এমন একটি অতি সাধারণ তরুণী যার দিকে কেউ একবারের বেশি দুবার তাকায় না, তেমনি একটা মেয়েকেও তিনি মঞ্চের উপর একেবারে বদলে দিয়ে একটি রহস্যময়ী মনোমুগ্ধকারী চোখ ঝলসানো সুন্দরী নারীতে পরিণত করে দিতে পারতেন। দৈহিক গড়ন আর মনোরম ভঙ্গি ছিল জিগফেল্ডের মঞ্চে প্রবেশের পাসপোর্ট। কীভাবে একজনকে মোহনীয় ও আকর্ষণীয় করে তুলতে হয় জিগফেল্ড তা ভালো করে জানতেন।

তিনি ছিলেন প্রাচ্যের যে-কোনো রাজার মতোই রাজকীয়। এশিয়া ও ইউরোপের সমস্ত বাজার তন্ন তন্ন করে দামি ও সবচেয়ে সুন্দর পোশাক কেনার জন্য উদার হস্তে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করেছেন। তাছাড়া তিনি মনে করতেন, শরীরের চামড়ার সাথে সুন্দর পোশাকের স্পর্শ না পেলে কোনো মেয়েই নিজেকে প্রকৃত সুন্দরী ভাবতে পারে না। এক রাখালের জন্য একবার তার মনোমতো টুপি খুঁজতে গিয়ে তিনি পুরো তিনমাস নিজের

Show Boat-এর প্রযোজনা বন্ধ রেখেছিলেন। আরেকবার তার একটা প্রযোজনায় ২৫,০০,০০০ ডলার ব্যয় করেও মাত্র একবার প্রদর্শন করে সেটা বন্ধ করে দেন। তার মনে হল প্রযোজনটি তার গৌরবময় ঐতিহ্যের জন্য যোগ্যতর হয় নি। তার প্রতিটি কাজ হত প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। তিনি তাঁর নিকটস্থ লোকের কাছেও টেলিগ্রাম পাঠাতেন। তাঁর কর্মচারীদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার জন্য প্রায় প্রতিদিন ভোর ছটায় বিছানা ছাড়তেন। জিগফেল্ড দশ-বারো ডলার বাঁচাবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিকল্পনা করতেন, আবার পরদিনই চোখের পলক না ফেলেই ওয়েল স্ট্রিটে একলাখ ডলার খরচ করে আসতে পারতেন। একবার এডউইন নামক এক ভদ্রলোকের কাছে থেকে জিগফেল্ড ৫০০০ ডলার ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু দেশের অপর প্রান্তে যাবার জন্য একখানি প্রাইভেট ট্রেন ভাড়া করে ওই টাকা উড়িয়ে দিলেন।

নিজের সৌন্দর্যবোধ এবং অদ্ভুত বিবেচনা শক্তি দ্বারা রমণীগণকে অনুভব করতে পারতেন যে তারা সুন্দরী। তার কোনো অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী রজনীতে তিনি তার নায়িকাদলের প্রতিটি মেয়েই তার কাছ থেকে এক বাক্স করে ফুলের তোড়া উপহার পেত। প্রত্যেক মহিলা, এমনকি বৃদ্ধারাও তার কাছে সহানুভুতিপূর্ণ ব্যবহার পেত। তিনি তার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত তারকাঁদের সপ্তায় ৫০০০ ডলার বেতন দিতেন, মৌসুমের শেষে দেখা যেত তাদের কারো ব্যাংকে জিগফেল্ডের চেয়েও বেশি টাকা জমেছে। জিগফেল্ড পঁচিশ বছর বয়সে দুরন্ত কর্কশ শক্তিধর স্যান্ডোর ম্যানেজার হিসেবে ভাগ্যাদেবীর কৃপালাভ করেছিলেন! এর দু'বছর পরে একেবারে দেউলিয়া অবস্থায় দেখা গেল লন্ডনে তখন তার হাতে একটা শিলিংও ছিল না। মন্টিকার্লোতে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতে বাজী ধরলেন তিনি–কিন্তু চাকা ঘুরতে ঘুরতে গায়ের জামাটা হারালেন। তবে কপর্দকহীন হওয়াটা এই মহান ব্যবস্থাপকের কাছে কোনো চিন্তার বিষয় ছিল না। তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল নিজের বুদ্ধি-বিবেক ও

আচার-আচরণের জাদু দিয়ে দুঃখ-দৈন্য দূর করে সাফল্যের তুঙ্গে আরোহণ করতে পারতেন।

আমেরিকার চতুর প্রয়োজকরা এনা হেল্ডকে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রচুর অর্থ প্রদানের লোভ দেখাচ্ছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত মাত্র সাতাশ বছর বয়স্কপ্রায় অপরিচিত ও কপর্দকহীন জিগফেল্ডই একেবারে এনার পোশাক ঘরে উপস্থিত হলেন, তাঁকে মুগ্ধ করলেন এবং তাকে চুক্তিপত্রে সই করালেন আর তরতরিয়ে উঠে এলেন খ্যাতি ও মর্যাদার উচ্চশিখরে। এনা হেল্ড আমেরিকায় ঝড় তুললেন। তাঁর খ্যাতির ফলশ্রুতিতে তার নামে সুগন্ধিদ্রব্য, পাউডার, ককটেল, টুপি, ঘোড়া, কুকুর, সিগারেট ইত্যাদির নামকরণ করা হল। অবশেষে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার চরম শিখরে আরোহণ করে এনা পরিণয়বদ্ধ হলেন জিগফেল্ডের সঙ্গে।

জিগফেল্ড কোনো ব্যাপারে চিন্তা করে মনস্থির করতে অপছন্দ করতেন। তার টেবিলে সবসময় এক কৌটা জ্যৈষ্ঠমধু রাখতেন। এ সম্পর্কে এক বন্ধুর প্রশ্নোত্তরে বলেছেন, ‘ওগুলো কালো, কাজেই কোন রঙটা আমার পছন্দ তা মনস্থির করতে আমাকে ভাবতে হয় না। চব্বিশ বছর ধরে কোলাহলময় নিউইয়র্কে ফ্লোরেঞ্জের প্রদর্শনীগুলো ছিল একেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তার উদ্বোধনী রজনীতে রাস্তায় রাস্তায়

গাদাগাদি হয়ে যেত, পর্দার পেছনে স্টেজে গোলমাল হয়ে যেত, স্টেজ কর্মীদের মধ্যে একটা ছোটাছুটি শুরু হত, সবার মধ্যে একটা কাজ আর তাড়াহুড়োর প্রতিযোগিতা লেগে যেত–কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তিটি সবসময় শান্ত-সুবোধ, ধীরস্থির ও শান্ত সমাহিত।

রজনীর বিশিষ্ট দর্শকবৃন্দ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জমকালো সান্ধ্যপোশাক এবং সাদা টাই পরে আসত কিন্তু জিগফেল্ড নিজে পরতেন একটা সাদাসিধে ধূসর রঙের ব্যবসায়ী পোশাক। ওই অনুষ্ঠানে নিজেকে তিনি একটা আসনে উপবেশন করার বিলাসটুকুন ভোগ করতে দিতেন না। ব্যালকনিতে ওঠার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পুরো অনুষ্ঠানটা পর্যবেক্ষণ করতেন।

১৯২৯ সালে ওয়াল স্ট্রিট ভেঙে পড়ার সময় এই মহান ব্যক্তিত্বটির কর্মজীবনে নাটক শেষের বিরতির আলো জ্বলে উঠে যবনিকাপাত হল। ১৯৩২ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় জিগফেল্ড শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি যখন ভুল বকাবকি শুরু করেন, মনে হচ্ছিল তখন তিনি কল্পনায় একটা নাটক পরিচালনা করছিলেন। তাঁর মঞ্চ ছিল তখন হাসপাতলের এক শুভ্র কক্ষ, মঞ্চে তখন তার একজন চাকর ছাড়া দ্বিতীয় কেউ ছিল না। জিগফেল্ড বিছানায় উঠে বসে অদৃশ্য অভিনেতা অভিনেত্রীদেরকে ডিরেকসন দিচ্ছিলেন। তিনি চীৎকার করে বলছিলেন—'পর্দা উঠাও, দ্রুতলয়ে সঙ্গীত দাও, সমস্ত আলো জ্বেলে দাও। শেষ দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত হও।'

মৃত্যুর শেষমুহূর্তে তিনি বলছিলেন, 'চমৎকার! দৃশ্যটা... সত্যি...চমৎকার... অপূর্ব।

বিলি সানডে : একজন জনপ্রিয় ধর্মপ্রচারক

ইতিহাসের সর্বাধিক জনপ্রিয় খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক ছিলেন একজন মদ্যপান প্রতিযোগী ও প্রাক্তন খেলোয়াড়, তার নাম বিলি সানডে। আমি তাকে অনেকবার অনেক কাছে থেকে দেখেছি। তিনি ছিলেন এক প্রচণ্ড ঝড়ের মতো দুরন্ত, তাঁর ধর্মোপদেশ ছিল সার্কাসের মতো উপভোগ্য। তাঁর কথা শুনে কেউ কখনো ঘুমিয়ে পড়ে নি। তার একটা গর্বের বিষয় ছিল যে, একটানা পঁয়ত্রিশ বছর ধরে শয়তানের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার কালে তিনি দশ লক্ষেরও বেশি মানুষকে কাঠগুঁড়োর পথ দিয়ে পরিচালিত করেছিলেন। সম্ভবত বিলি সানডেই ছিলেন মদ্য বিক্রয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদী।

বিলি সানডে একবার সেন্টপিসবার্গে আট সপ্তাহ ধর্মপ্রচার করেছিলেন, খবরের কাগজের শিরোনামে তার ধর্মসভার খবর ছাপা হত। সমস্ত শহর তার ধর্মপ্রচারে ও উদাত্ত আহ্বানে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। দলে দলে লোক তার সভায় উপস্থিত হয়ে সুন্দর বাণীগুলো শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত।

বিলি সানডে বলতেন, আমি একটা নিকৃষ্ট গেঁয়ো ভূত, চুলে রাজহাঁসের চর্বি মেখেছি, উনুনের কালি দিয়ে জুতো রং করেছি। আমার বুড়ো নাকটা চটের তোয়ালে দিয়ে মুছেছি এবং আমার থালায় করে কপি পান করেছি। আমার যখন বলা উচিত ছিল এরকম করেছিলাম তখন এটা করে এবং যখন বলা উচিত ছিল 'আমি দেখেছি তখন আমি আমি বলেছিলাম' বলেছি। তবুও আমি স্বর্গে যাওয়ার আশা রাখি।

বিলি সানডে আইওয়া নামক স্থানে একটা ছোট কাঠের কেবিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এক এতিমখানায় বড় হয়েছিলেন। মাত্র পনের বছর বয়সে একটা স্কুলের তত্ত্বাবধায়কের চাকরি পান। তার বেতন ছিল মাসে পঁচিশ ডলার এবং এই দিয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পান। মার্শাল টাউনে একজন ঠিকাদারের সহকারি রূপে কাজ করার সময় বিলি সানডে বাস্কেটবল খেলোয়ার হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন বিশ্ববিখ্যাত বেসবল খেলোয়াড়। মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর নামাজাদা বেসবল খেলোয়াড় হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি বলেছেন, আমি বেসগুলি মাত্র চৌদ্দ সেকেন্ডে ঘুরে আসতে পারতাম এবং এ রেকর্ড আজ পর্যন্ত কেউ ভাঙতে পারে নি। এর পাঁচ বছর পর তিনি একজন মদ্যপায়ী বল খেলোয়াড় থেকে পরিণত হলেন শ্রেষ্ঠ সম্মোহনী ধর্মপ্রচারকে। তার ধর্ম প্রচারক হিসেবে সম্মোহিত হবার ঘটনাটি ঘটে আঠার শো সাতাশি সালের এক রোববার বিকেলে-বিলি সানডে কয়েকজন বিখ্যাত খোলোয়াড়ের সাথে শিকাগোর রাজপথ দিয়ে হেঁটে গিয়ে একটা সেলুনে ঢুকলেন। পাশের রাস্তা দিয়ে নারী পুরুষ বাঁশি ও ঢাক বাজাতে বাজাতে যাচ্ছিল আর যিশুর স্তবগান গাচ্ছিল। ওই স্তবগানটি তিনি আইওয়ার কাঠের কেবিনে তার মাকে গাইতে শুনেছেন। গানটা শুনে মায়ের কথা মনে পড়ে গেল, তিনি খুব কাঁদলেন। তখন মিছিল থেকে এক যুবক ছুটে এসে তাকে বলল, ‘আমরা প্যাসিফিক গার্ডেন মিশনে যাচ্ছি। তুমি আমাদের সাথে যাবে না। আমি নিশ্চিত যে সেখানে তোমার ভালো লাগবে।’ বিলি সানডের মনে হঠাৎ করে একটা পরিবর্তন এল। মনের অদৃশ্যকোণের কোথায় যেন যিশুর স্তবগানটি ঝাঁকি দিল, তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমার হয়ে গেছে। আমি আর তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারছি না। আমার পথ ভিন্ন হয়ে গেল। এই বলে তিনি তাদের দিকে পিঠ ফিরালেন। তারা কেউ কেউ হাসল, কোউ উপহাস করল। একজন তাকে

উৎসাহও দিল। তারপর তিনি মানুষকে সৎপথে, যিশুর পথে এবং ঈশ্বর নির্দেশিত পথে আহ্বান .. করার ব্রত নিলেন।

১৯১৯ সালে বিলি সানডে যখন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক যান, তার আগে সেখানে কখনো তেমন ধর্মোন্মাদনা দেখা যায় নি। তিনমাস আগে থেকে তার আগমনে কথা প্রচার করা হয়েছিল এবং আগমনের প্রস্তুতি হিসেবে কমপক্ষে কুড়ি হাজার প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৬৮ নং স্ট্রিটে এবং ব্রডওয়েতে চার'শ শ্রমিক কুড়ি হাজার লোকের বসার উপযোগী তাঁবু তৈরির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল এবং কাঠগুঁড়োর পথ তৈরি করার জন্য চারগাড়ি বোঝাই করাতের গুঁড়ো এনে মেঝেতে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। মঞ্চের ওপরে ঐক্যতান গায়কদের জন্যেই দুই হাজার আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নিউইয়র্ক অবস্থানকালে এই বিশ্ব বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ লোকের কাছে ধর্মপ্রচার করেছিলেন এবং প্রায় এক লক্ষ পাপী ব্যক্তিকে ধর্মোপদেশ দিয়ে সৎপথে এনেছিলেন।

বেজিল জেহারফ : লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাধিপ্রস্তর হল তাঁর স্মৃতিসৌধ

জেহারফ হল বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী ও রহস্যময় এবং চরম ঘৃণিত এক ব্যক্তির নাম। এক সময় ঘোষণা করা হয়েছিল, যে কেউ এই জোহারফকে হত্যা করতে পারবে তাকে একলাখ ডলার পুরস্কার দেয়া হবে। তার অসংখ্য ঘটনাবহুল জীবনীসংবলিত বই লেখা হয়েছে।

তিনি ভয়াবহ দারিদ্র্যের কোলে জন্মগ্রহণ করেও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী ব্যক্তি হতে পেরেছিলেন। আর সম্পদশালী হয়েছিলেন ভয়াবহ আগ্নেয়াস্ত্র যেমন-বন্দুক, মেশিনগান, কামান আর বিস্ফোরক দ্রব্য বিক্রি করে। তাঁর জীবনীগ্রন্থের শুরুতে এ কথাগুলো লেখা ছিল, 'লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাধি প্রস্তর হবে তার স্মৃতিসৌধ–আর তাদের মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা হবে তাঁর স্মৃতিফলকের গাঁথা।'

।বয়স যখন আটাশ বছর তখন সাপ্তাহিক পঁচিশ ডলারের বিনিময়ে অস্ত্র বিক্রির একটা চাকরি পান। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, বন্দুক বেচার সবচে প্রধান উপায় হল বন্দুকের জন্য চাহিদা সৃষ্টি করা। এই ভেবে তিনি গ্রামবাসীদের মনে ভয়ের সৃষ্টি করতে লাগলেন। তাদের বললেন যে রক্তপিপাসু শত্রুদ্বারা তারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে।

সুতরাং মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে হলে তাদের অবশ্যই অস্ত্রসংগ্রহ করা উচিত। তাঁর প্ররোচনায় সমস্ত দেশের ওপর দিয়ে উত্তেজনা তরঙ্গায়িত হতে থাকল, পতাকা আন্দোলিত হল। গ্রিস বাহিনী সৈন্য সংখ্যা বাড়িয়ে জেহারফের কাছে থেকে বন্দুক কিনল, একটা ডুবো জাহাজ কিনল। এভাবে নিজের চতুরতা বুদ্ধি বিবেক দ্বারা লক্ষ লক্ষ ডলার উপার্জন করে গ্রিস ছেড়ে তুরস্কের পানে ছুটলেন এবং তাদেরও উত্তেজিত করার কাজে কোমর বেঁধে নামলেন। তাদের বললেন, "তোমরা দেখ, গ্রিসের লোকেরা পৃথিবী থেকে তোমাদের নাম মুছে ফেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।" এতেই কাজ হল। তুর্কিরা জাহাজ কিনল দুটো আর তাদের মধ্যে অস্ত্র কেনার একটা প্রতিযোগিতা লেগে গেল। এতে অল্পকাল পরেই জেহারফের ভাগ্যে তিরিশ কোটি ডলার আয়ের ব্যবস্থা হয়ে যায়-যার সম্পূর্ণটা ছিল শোণিত সিক্ত। জেহার বিভিন্ন দেশের জাতীয় রীতিকে পুঁজি করে, পুরুষানুক্রমে শত্রুকে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করে এবং যুদ্ধের প্ররোচনা দিয়ে বছরের পর বছর ধরে নিজের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি জার্মানি, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইটালিতে অস্ত্র কারখানার মালিক হয়ে গেলেন। অর্ধ শতাব্দী ধরে তিনি তার গতিবিধিকে অত্যন্ত গোপনীয়তায় আচ্ছাদিত করে শিকারী বিড়ালের মতো নিঃশব্দে ইউরোপের যুদ্ধ-শিবিরগুলোতে যাতায়াত করেছেন।

জনশ্রুতি আছে যে, তিনি তার সহকর্মী হিসেবে দুজনকে খুঁজে বের করেছেন যারা দেখতে তার মতো ছিল। তাদের কাজ হল বিভিন্ন দেশ ও শহরে জনসমক্ষে ইতস্তত ঘোরাফেরা করা, এই সুযোগে তিনি বিভিন্ন যুদ্ধ শিবিরে গোপন পাঁয়তারা করা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি কখনো স্বেচ্ছায় ছবি তোলেন নি, কাউকে তার সাক্ষাতের অনুমতি দেন নি, কখনো কোনো কাজের ব্যাখ্যা দেন নি এমনকি তার সম্বন্ধে যত দুর্নাম ও নিন্দা বর্ষণ করা হত, তিনি তার কোনো উত্তর করতেন না। ছাব্বিশ বছর বয়সে একবার গ্রিস থেকে ফ্রান্স

যাওয়ার পথে রেলগাড়িতে সতের বছরের এক তরুণীকে বিয়ের প্রস্তাব দেন, কিন্তু মহিলাটি ছিল এক আধপাগলা ও আইবুড়ো ডিউকের স্ত্রী।

জেহারফ এই মহিলার স্মৃতি বক্ষে ধারণ করে অর্ধশতাব্দী ধরে প্রতীক্ষা করলেন। অবশেষে ১৯২৩ সালে মহিলার স্বামী এক পাগলাগারদে মারা গেলে জেহার তাকে বিয়ে করেছিলেন। তখন মহিলার বয়স পঁয়ষট্টি আর জোহারফের চুয়াত্তর। অবশ্য তাদের বিবাহিত জীবন মাত্র আঠারো মাস স্থায়ী ছিল। শেষ বয়সে তিনি প্যারিসের অদূরে এক প্রকাণ্ড বাগানবাড়িতে কাটাতেন অথচ তার জন্ম হয়েছিল তুরস্কের জানলাবিহীন একটি মাটির ঘরে। ছোটবেলায় তিনি নোংরা মেঝেতে শুতেন, প্রায়ই তাকে অনাহারে কাটাতে হত। তিনি মাত্র পাঁচ বছর স্কুলে যান কিন্তু তিনি চোদ্দটা ভাষায় কথা বলতে পারতেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডক্টর অব সিভিল ল' উপাধিতে ভূষিত করেছে। তিনি যখন লন্ডনে যান, তাকে চোর বলে জেলখানায় ঢোকানো হয়েছিল কিন্তু ত্রিশ বছর পর ইংল্যান্ডের রাজা তাকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি অর্ধশতাব্দী ধরে ডায়েরি লিখেছিলেন। তার গোপন ডায়েরিগুলো মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করে ফেলার জন্য নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন।

ভূমিকা : বরণীয় যারা স্মরণীয় যারা

প্রতি মিনিটে যার সম্পদ এক শ ডলার করে বাড়ছে–আপনি তাকে চিনতে পারেন? আপনি কোটিপতি হবার স্বপ্ন দেখছেন, অথচ আপনি তাকে জানেন না, যিনি অগণন কোটিপতি তৈরি করেছিলেন। এর চেয়েও মজার কথা হচ্ছে–আপনি সারাক্ষণ ফিটফাট থেকে কিংবা রূপচর্চা করে অথবা নানা কৌশলের আশ্রয় নিয়ে সুন্দরী ললনার মন জয় করতে চান অথচ আপনি জানেন না সেই বিশ্ব প্রেমিককে, যাকে একদণ্ড কাছে পাওয়ার বাসনায় বহু ডগমগা মেয়ে তাদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে রাজি।

যদি সত্যিই আপনি এসব ঘটনা ও ঘটনার নায়ক-নায়িকাদের না চিনে থাকেন তবে ব্যাপারটা অতিশয় লজ্জাজনক-নয় কি? এমনিতে বসে-বসে আঙুল চুষবেন আপনি আর মনে-মনে কোটিপতি হবার উচ্চাশা পোষণ করবেন কিংবা নীরব কবিতার রঙ্গ মনে মেখে নিয়ে ভাববেন অনায়াসেই মেয়েদের মনের রাজাধিরাজ হয়ে যাব–তা কিন্তু কখনো সম্ভব হবে না।

মানুষকে না জেনে আপনি মানুষের মতো মানুষ হতে পারবেন না। আপনি যা হতে চান–যা কিছু পেতে চান, সেজন্য পথ বা পন্থা চাই। আর সেটা পাবেন কোত্থেকে? মানুষের জীবন থেকে। হ্যাঁ, মানুষের জীবনই জীবন সাফল্যের মস্ত এক সফল অভিধান।

এই সত্য কথাটাই আমি আপনাদের জানাতে চেয়েছিলাম। আর সেজন্য আমি বহুদিন খুঁজে, বহু শ্রমের বিনিময়ে একটি বই সংগ্রহ করি। এটাই সেই বই। তারপর আসে উত্তম

অনুবাদের কথা। তাতেও কোথাও কোনো ত্রুটি রাখা হয় নি। ‘ব্যক্তিত্ব প্রতিভার বিকাশ’ একটি অনুপম রচনা–যার নির্যাস আপনাকে প্রেরণা দেয়; যার প্রতিটি অক্ষর স্বর্ণ ইট হয়ে আপনার ভবিষ্যতের ‘স্বপ্ন-তাজ’ গড়ে তোলে; যার প্রতিটি উপদেশ আপনার চলার পথে দিকনির্দেশক বাতিঘরের মতো কাজ করে।

শুধু এটুকু বলি না যে, এই বই পড়ে আপনি নিরেট জ্ঞানলাভ করুন এবং কট্টরপন্থি মানুষের মতো জ্ঞানের বোঝা বাড়িয়ে তুলুন। সেই জ্ঞান বিশ্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারিক পুস্তক প্রণেতা ডেল কার্নেগি কখনো দেন না। তার জ্ঞান-দানে মজা আছে; আর তার বই সুখপাঠ্য ও আনন্দময়-এতে কারো ভিন্নমত ছিল না এবং নেইও।

তাই একই সঙ্গে জানা যাচ্ছে সে-সব মজার জীবন-যেখানে ভুল ট্রেনে চেপে একজন ধর্ম প্রচারক কী করে শ্রেষ্ঠ জাদুকর হয়ে যাচ্ছে; ছোট্ট একটা অপমান সহ্য করে একজন ব্যক্তি বিশ্বখ্যাত আইনজীবী হয়ে গেলেন; খ্যাতিকে পদাঘাত করতে গিয়েও যিনি সুখ্যাতি পেলেন ইত্যাদি।

এসব তো অজানা মানুষের বিচিত্র জীবন কথা। এর থেকেও বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে, জানা লোকদেরই জীবনের গোপন সব বিচিত্র বিষয়। আপনি জানেন কি, নাট্যম্রাট শেক্সপিয়ার কখনো নাটকই লিখতে চান নি? আপনি জানেন, রুজভেল্টের বুকে যখন গুলি করা হল তখনো তিনি বক্তৃতা দিয়েই যাচ্ছিলেন? আপনি জানেন কি, ক্যাপ্টেন ফ্যালকন মেরু রহস্য খুঁজতে গিয়ে কীভাবে ঈশ্বর রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন?

আপনার এত কথা জানার অবসর কোথায়-তাই না? না এজন্য ভাবনার কিছু নেই। কার্নেগি সবার সমস্যা সম্পর্কেই সচেতন। আর তাই এইসব মজার জীবনকাহিনী ও ঘটনাকে তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাঁচ মিনিটে সহজপাঠ্য করেছেন। খুব কষ্টে বইটি আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি বলে আমি গর্বিত ও আত্মতৃপ্ত। প্রাথমিকভাবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যা সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি রয়ে গেল সে জন্য আমি দুঃখিত।

সম্পাদক

মার্টিন জনসন : ভ্রমণের জন্যে রাঁধুনি হয়েছিলেন

মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে মার্টিন জনসন পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন। মার্টিন যখন একটা ছোট্ট ছেলে, তখন পৃথিবীর দূর-দূরান্ত থেকে যে সব বাক্স আসত মার্টিন সেগুলো নিজে খুলতেন। বাক্সের লেবেলের উপরে লেখা রং-বেরঙের দেশের নামগুলো তার মনোযোগ আকর্ষণ করত। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতেন। ওই সমস্ত দেশে তিনি একসময় গিয়ে সেখানকার ধুলো মাড়াবেনই। অবশেষে সেই ছোট্টবেলায় একদিন বাড়ি ছেড়ে পালালেন জনসন। পায়ে হেঁটে যুক্তরাষ্ট্র পাড়ি দিলেন এবং একটা জাহাজে করে ইউরোপে এলেন। ইউরোপে এসে যখন যা কাজ পেলেন তাই করতে লাগলেন।

এ অবস্থায় ব্রুসেসে তিনদিন না খেয়ে কাটালেন। ব্রেস্টে এসে গৃহকাতর অন্তরে সুবিশাল আটলান্টিক মহাসাগরের বালুকাবেলায় বসে-বসে একদৃষ্টে নোনা জলের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। লন্ডনে তাকে প্যাকিং বাক্সের ভিতর ঘুমাতে হত। তারপরে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে অবশেষে একদিন নিউইয়র্কগামী একটা জাহাজে উঠে লাইফ বোটে লুকিয়ে রইলেন। সেই লুকিয়ে থাকার ঘটনাতেই তার জীবনের সম্পূর্ণ গতিপথের মোড় ঘুরে গেল এবং এক মোহময় দুঃসাহসিতার পথে তার জীবনের যাত্রা শুরু হল। লাইফ বোটে এক ইঞ্জিনিয়ার তাকে একটা পত্রিকা দেখালেন যাতে জ্যাক লন্ডনের লেখা একটা ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ ছিল। জাক লন্ডন লিখেছেন কীভাবে তিনি মাত্র তিরিশ ফুটের একটা নৌকায় করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে মনস্থ করেছিলেন।

ইনডিপেন্ডেন্সে নিজ বাড়িতে গিয়ে সাথে-সাথে জনসন আট পৃষ্ঠার একটা চিঠি লিখলেন জ্যাক লন্ডনের কাছে। তাতে আবেগময় ভাষায় জ্যাক লন্ডনকে তার পৃথিবী প্রদক্ষিণের সঙ্গী করার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন তিনি। এক জায়গায় লিখলেন, আমি ইতিমধ্যেই বিদেশ ঘুরে এসেছি। শিকাগো থেকে সাড়ে পাঁচ ডলার পকেটে পুরে যাত্রা শুরু করেছিলাম। আর যখন ফিরে এলাম তখনো আমার পকেটে পঁচিশ সেন্ট অবশিষ্ট ছিল।' চিঠি লেখার পর পুরো দুটো সপ্তাহ তাকে অধীর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠায় কাটাতে হল। অবশেষে পেয়ে গেলেন জ্যাক লন্ডনের টেলিগ্রাম। তাতে শুধুমাত্র তিনটি শব্দ লেখা ছিল–"তুমি রাঁধতে পারো? চিন্তায় পড়ে গেলেন জনসন, তিনি যে আসলেই রাঁধতে জানেন না। অবশেষে বুদ্ধি করে টেলিগ্রামের মাধ্যমেই উত্তর পাঠালেন, 'যাচাই করে দেখুন। টেলিগ্রামটি ডাকে দিয়ে বাড়ি ফেরার পথেই এক রেস্টুরেন্টের রান্না ঘরে বাবুর্চির চাকুরি যোগাড় করলেন তিনি। অবশেষে জ্যাক লন্ডনের সেই ছোট্ট নৌকাটি যখন প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি জমাল, দেখা গেল মার্টিন জনসন তার একজন অন্যতম আরোহী। তিনি নিয়োজিত হলেন প্রধান বাবুর্চি হিসেবে। তার বাস্তবলব্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারা ভালো ভালো ও উন্নতমানের খাবার তৈরি করতে পারতেন। সমুদ্র ভ্রমণকালে প্রয়োজনীয় খাদ্যসম্ভার ক্রয় করার ভার ছিল মার্টিনের উপর। তিনি হিসেব করে দেখলেন যে, যে পরিমাণ লবণ, মরিচ ও মশলা সঙ্গে নিয়েছিলেন তা একটা সাধারণ নাবিক দলের দু'বছর চলে যাবে।

সমুদ্র ভ্রমণকালে জনসন জাহাজ চালাতে শিখে একজন দক্ষ নাবিকে পরিণত হয়ে গেলেন। একদিন বাহাদুরী ফলানোর জন্য তিনি মানচিত্রে জাহাজটির অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার হিসেবে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তবুও তিনি নিরুৎসাহী হলেন না এবং তার কৌতূহল ও উৎসাহ নিবৃত করলেন না।

তারপর অনেক বছর কেটে গেল। মার্টিন জনসন সাত সমুদ্র পার হয়ে দক্ষিণ সমুদ্রের প্রবালদ্বীপ থেকে আরম্ভ করে আফ্রিকার গহীন অরণ্য পর্যন্ত সমস্ত জায়গা পরিভ্রমণ করলেন। আমেরিকায় সর্বপ্রথম জনসনই নরখাদকের ছবি প্রদর্শন করেন। তিনি ক্ষুদ্রকায় ও বিরাটকায় মানুষ, জিরাফ, হাতি ও অন্যান্য জীবজন্তু এবং আফ্রিকার জন্য জীবজন্তুর সম্পূর্ণ বন্যজীবনের ছবি তুলেছেন–যেগুলি পরবর্তীতে হাজারো চলচ্চিত্রের পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেছে। শত-শত বিলীন হয়ে যাওয়া বন্যপ্রাণীর যে অদ্ভুত জীবন জনসন সেলুলয়েডের ফিতায় বন্দি করেছেন তা শতাব্দী ধরে একটা মোক্ষম দলিল হয়ে থাকবে। জনসন হাজার হাজার সিংহের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। কিন্তু মেরেছিলেন সবে দুটো! তিনি বলেছেন যে, আফ্রিকায় শেষ কয়েকটি মাসে অগণিত সিংহ দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি একটাও শিকার করেন নি। আসলে তার সঙ্গে কোনো বন্দুকই ছিল না।

ব্যক্তিত্ব অর্জন ও প্রতিভার বিকাশ মার্টিন জনসন বলেছেন, একটি সিংহ যে কোনো দিন মানুষের দ্বারা উত্যক্ত হয় নি। তার যদি ক্ষুধা না থাকে তাহলে মানুষের গন্ধ পেলেও তাকে আক্রমণ করবে না। একবার মোটরগাড়ি চালাতে-চালাতে জনসন পনেরটি সিংহের একটা দলের মাঝখানে পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সিংহগুলো যেখানে ছিল সেখানেই শুয়ে থাকল আর পোষ বেড়ালের মতো পিটপিট করে তাকাতে থাকল। একটা সিংহ তো এগিয়ে এসে তার গাড়ির সামনের চাকার টায়ার চিবানো শুরু করে দিল। আবার এক সিংহীর এত কাছ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে গেলেন যে সিংহীটা ইচ্ছে করলে থাবা বাড়িয়ে গাড়ি ছুঁতে পারত। কিন্তু সে তার একগাছি গোঁফও নাড়ল না। সিংহ একটা শান্তশিষ্ট জন্তু কিনা সে ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন যে, একটা সিংহকে বিশ্বাস আত্মহত্যার সামিল। একটা সিংহ যে কখন সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠে তা আপনি কিছুতেই জানতে পারবেন না, আর

পৃথিবীতে একটা আক্রমণোদ্যত সিংহের চেয়ে সাংঘাতিক ও ভয়ঙ্কর আর কিছুই হতে পারে না।

জনসনকে তার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা জানাতে বলায় তিনি বলেছেন যে, তার জীবনের বহু দুর্ঘটনা ঘটেছে তবে সেগুলো খুবই মজার ও রোমাঞ্চকর।

একবার তো তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছিল নরখাদকদের একহাঁড়ি সুরুয়ার মধ্যে। এটা ঘটেছিল যখন তিনি প্রথম একদল নরখাদকের ছবি তুলেছিলেন যা ইতপূর্বে আর কেউ তোলে নি। তখনকার সময়ে শ্বেতাঙ্গরা আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের ধরে এনে দাস হিসেবে বিক্রি করে ব্যবসা করত। তারা হয়ে উঠেছিল শত্রুভাবাপন্ন এবং ক্ষুধার্ত। একদিন তারা মার্টিনের আকৃতি নিরীখ করে ফন্দি আঁটল এ ছোঁকরাকে দিয়ে মজাদার কাবাব বানাবে। তিনি একদিন যখন বুনো সর্দারের সঙ্গে গল্পরত ছিলেন আর উপহার সামগ্রী পেশ করেছিলেন সে সময় একদল নরখাদক এসে তাকে ঘিরে ফেলল। তার সাহায্যকারীরা কেউ কাছে ছিল না। সঙ্গে ছিল মাত্র একটা রিভলভার। কিন্তু তারা ছিল সংখ্যায় শতগুণ। তিনি হতাশ হয়ে জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে, শান্তভাবে কথা বলতে চাইলেন কিন্তু ইতোমধ্যেই চারদিকে ক্ষুধার্ত নরখাদকদের তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়ে গেছে। তারা কল্পনায় চেটেপুটে হবু কাবাবটার আস্বাদ গ্রহণ করছিল। এই প্রথমবারের মতো তিনি ভাবলেন-এসব ভ্রমণ ট্রমন বাদ দিয়ে আগে থেকে বাবার সঙ্গে জুয়েলারি ব্যবসায় নেমে পড়লে নেহাৎ মন্দ হত না। তারপর যেই নরখাদকরা চিৎকার করে ছুটে এসে তাকে ঝাপ্টে ধরতে যাবে তখন একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল। ঠিক তখন অদূরে উপসাগরের তীরে একটা ব্রিটিশপাহারাদার জাহাজ এসে ভিড়ল। নরখাদকরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকল। তখন জনসন আশার আলো দেখতে পেলেন। তিনি মাথা

ঝাঁকিয়ে বুনো সরদারকে বললেন, ওই দেখুন, আমার জাহাজ আমাকে খুঁজতে চলে এসেছে। আপনাদের সবার সঙ্গে মোকাবেলা করে আনন্দিত হলাম। সবাইকে ‘গুডবাই’ জানিয়ে, কেউ তাকে থামবার মতো সাহস সঞ্চয় করার আগেই, ভোঁ দৌড় দিলেন জাহাজের দিকে।

মেয়ো ভ্রাতৃযুগল : আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত চিকিৎসক

অর্ধশতাব্দীর আগে রচেস্টার শহরটি যদি ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত না হত তবে হয়তো ভেষজ দ্রব্যের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার আজো অজানা থেকে যেত। ঔষধের ইতিহাসে দু-জন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক মেয়ো ভ্রাতৃদ্বয়ের আবাস হিসেবেই শহরটি বিখ্যাত।

আবিষ্কারটি ছিল উন্মাদ রোগ সারানোর একটি ওষুধ। ওষুধটি দুর্বল ও উন্মাদ ব্যক্তিদের শরীরে ইনজেকশন দেয়া হয়, আর প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই শরীরে রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া বদলে যায় এবং ব্যক্তিটি সুস্থ হয়ে ওঠে। মানবসমাজের জন্য এই আবিষ্কারের গুরুত্বটা নিচের বিবরণ থেকে আপনারাও বিচার করে দেখুন।

আমেরিকার হাসপাতালগুলিতে মানসিকরোগীর সংখ্যা অন্যসব রোগীর চাইতেও বেশি। এখানকার উচ্চবিদ্যালয়গুলোর প্রতি ১৬ জনের মধ্যে একজন ছাত্রজীবনের একটা সময় মানসিক হাসপাতালে কাটায়। গত একযুগ ধরে আমেরিকায় মানসিক রোগীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। যদি আর এক শতাব্দী ধরে এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে সমগ্র জনসংখ্যার অর্ধেককেই মানসিক হাসপাতালে বাস করতে হবে।

মেয়ো ভ্রাতৃদ্বয় এ অদ্ভুত প্রতিষেধক নিয়ে গবেষণা করছিলেন, তাঁরা ছিলেন খ্যাতনামা অস্ত্র চিকিৎসক। তাদের বাবা ডাক্তার মেয়ে যখন আশি বছর আগে রচেস্টারে বাস করতে

আরম্ভ করেন, তখন। সেখানে মাত্র দু-হাজার লোক বাস করত। তার সর্বপ্রথম রোগী ছিল মাত্র দু'জন–একটি ঘোড়া ও একটি গাভী। রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে এক যুদ্ধকালে ডাক্তার মেয়ো নিজে বন্দুক ধরেছিলেন এবং বহুসংখ্যক আহতদের বিনা পয়সায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে চিকিৎসা করেছেন। তাঁর দুই ছেলে উইলিয়াম ও চার্লস যারা পরবর্তীতে মেয়ো ভ্রাতৃদ্বয় নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন তারা একটা ওষুধের দোকানে কাজ করতেন। তারপর তারা মেডিকেল কলেজে গেলেন। এরপরে ঘটল সেই ঐতিহাসিক খুব দুঃখজনক ঘটনাটি। প্রেইরি অঞ্চলের উপর দিয়ে এক প্রবলতম ঘূর্ণিঝড় দেবতার প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলার মতো সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে বয়ে গেল। ঝড়ের প্রচণ্ড আঘাতে রচেস্টারের চেহারা একেবারে পাল্টে গেল। শত শত লোক হতাহত হল। বাবা মেয়ে ও ভ্রাতৃদ্বয় আহতদের চিকিৎসা করতে লেগে গেলেন। কনভেন্ট সিস্টারস অব। সেন্ট ফ্রান্সিস-এর মাদার সুপিরিয়র সিস্টার্স আলফ্রেড তাদের কাজে মুগ্ধ হয়ে ১৮৮৯ সালে সেখানে একটি হাসপাতাল করে দিলেন। তখন বৃদ্ধ ডাক্তার সত্তর বছরের বৃদ্ধ আর দুই পুত্র তাদের ভাষায় নবীনদের মধ্যে নবীনতম। ভবিষ্যতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উইলিয়াম মেয়ে হলেন ক্যান্সার রোগের নির্ভরযোগ্য রোগবিশারদ। এক ভাই অন্য ভাইকে যোগ্যতর মনে করতেন, তারা উভয়েই ছিলেন অন্যতম অস্ত্র চিকিৎসক। তাদের কাজের দ্রুততায় অনেক চিকিৎসক বিস্মিত হয়ে যেত। রচেস্টার শহরের অস্তিত্ব গড়ে উঠেছিল মেয়ো ক্লিনিকের জন্যই। এখানকার রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া চলাচল নিষিদ্ধ, বাসগুলি নিঃশব্দে চলে, এমনকি রাস্তাঘাটে লোকেরা কথা-বার্তাও খুব আস্তে-আস্তে বলে। মেয়ো ভাতৃদ্বয়ের কাজের এক তৃতীয়াংশই ছিল দান স্বরূপ। তাদের নিকট কোনো দরিদ্র রোগী এসে বিনা চিকিৎসায় ফিরে যায় নি। এক ব্যক্তি তার জীবন রক্ষাকারী মেয়ো ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রাপ্য প্রতিশোধের জন্য ক্ষেতখামার বন্ধক দিয়েছিল। যখন তারা ব্যাপারটা। জানতে পারলেন তখন তার চেক ফেরত দিলেন এবং অসুস্থ থাকাকালীন

লোকটার যে ক্ষতি হয়েছিল তা পূরণের জন্য নিজেরাই কয়েকশ ডলারের চেক পাঠিয়ে দিলেন। তাদের একমাত্র কামনা ছিল নিপীড়িত মানবতার সেবা করা। তারা খ্যাতির পরোয়া করতেন না, অথচ তারাই হয়েছিলেন আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত চিকিৎসক।

লরেন্স টিবেট : প্রত্যাখান তাকে অনেকদূর নিয়ে গেছে

১৯২২ সালে লরেন্ট টিবেট এত গরিব ছিলেন যে, লস এঞ্জেলসের কাছে একটা গ্রামে অত্যন্ত কষ্টকর অবস্থায় দিন কাটাতেন। রোববার গির্জায় অন্যান্য গায়কদের সাথে গান গাইতেন এবং মাঝেসাজে কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানের গান গেয়ে সামান্য উপার্জন করতেন। তিনি গ্রামে একটা বাসা ভাড়া করে থাকতেন এবং বাসাটা ছিল আঙুর খেতের মধ্যস্থলে। তিনি স্বীকার করেছেন তার এমনও সময় গেছে যখন শুধু আঙুর ছাড়া আর কোনো খাবার ছিল না। গায়ক হিসেবে বাসাভাড়ার টাকাটাও উপার্জন করতে পারতেন না। একবার দশ মাসের ভাড়া বাকি পড়ে গেলে; তখন আঙুর তুলে এবং আঙুর গাছ ছাটাই করে তা পরিশোধ করতে হয়েছিল।

লরেন্ট টিবেট যথেষ্ট পড়াশুনা করেছিলেন কিন্তু জীবনের করুণ ও দুঃখময় অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কিছুই করতে পারলেন না। তার বন্ধু রুপার্ট হিউযের তার ওপর অপরিসীম আস্থা ছিল। তিনি লরেন্ট টিবেট সম্পর্কে অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। হিউয তোমার গলায় দামি কণ্ঠস্বরের সকল উপাদান আছে। তোমার নিউইয়র্ক গিয়ে শিক্ষালাভ করা উচিত। এই ছোট্ট বন্ধুসলভ উৎসাহটাই তার জীবনের গতিপথটাকে এক উজ্জ্বলময় ভবিষ্যতের দিকে প্রভাবিত করতে তাকে সহায়তা করল।

নিউইয়র্ক এসে মাসে পাঁচ ডলারের বিনিময়ে একটা পিয়ানো ভাড়া করলেন। টিবেট। নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটান অপেরা হাউসের সবচেয়ে সস্তা একটা আসন ক্রয় করার ক্ষমতাও তার হল না। অপেরা হাউসের পেছনে দাঁড়িয়ে সুন্দরী মেরি গার্ডেনের মোহময় নাট্যাভিনয় দেখবার জন্য দু'ডলার বিশ সেন্ট করে দিতেন। ঘরভাড়া ও সঙ্গীত শিক্ষার জন্য তাকে বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করতে হত। দশবছর পর লরেন্স টিবেট নিজেই মেট্রোপলিটানের রঙ্গমঞ্চে উত্তেজনাময় আনন্দধ্বনির মধ্যে একটিমাত্র নাট্যাভিনয় দর্শকদের উপহার দেওয়ার জন্য বাইশবার অনুরোধ এসেছিল এবং তিনি সমগ্র বিশ্বে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসবে সুখ্যাতি অর্জন করে ছিলেন। আপনারা তখনকার সময়ে নির্মিত বহু চলচ্চিত্রে তার সুকণ্ঠ শুনেছেন। তিনি বলেছেন অনেক উচ্চাভিলাষী গায়কের ব্যর্থতার কারণ তাদের কণ্ঠস্বরের নির্বুদ্ধিতা এবং প্রদর্শন দক্ষতার অভাব।

লরেন্স টিবেট ক্যালিফোর্নিয়ার বেকার্সফিল্ডে শৈশবকাল কাটান। তার বাবা ছিলেন একজন রাখাল। তিনি গোচারণ ক্ষেত্র ঘোড়ায় চড়ে তদারক করতেন। তার কোমরে সবসময় মুক্তাখচিত বাটওয়ালা একটি রিভলভার রাখতেন। তার লক্ষ ছিল অব্যর্থ। পশ্চিমাঞ্চলের এক কুখ্যাত ব্যাংক লুটকারী ডাকাত জিমম্যাক কিনির সাথে এক সংঘর্ষে তাঁর বাবা গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যান। টিবেট বলেছেন যে, বাবার এই করুণ মৃত্যু না হলে তিনি একজন গায়ক এবং অভিনেতা হওয়ার সাহস করতেন না। তার বাবার শিক্ষা তার ওপর জাদুকরী প্রভাব বিস্তার করেছিল। এখনো তিনি বছরে মাত্র একটা সিগার খান এবং যখন খান তার মনে হয়ে যে, সাংঘাতিক ধরনের একটা অন্যায় করছেন আর সাক্ষাৎ শয়তান দাঁড়িয়ে অন্যায়ের পথে ঠেলে দিচ্ছে।

স্কুল জীবনে টিবেটের মনে হীনতাবোধের সৃষ্টি হয়। তার মা ঘরভাড়া দিতেন। তার মাত্র একপ্রস্থ কাপড় ছিল, পাজামাগুলো অত্যন্ত ছোট হয়ে গিয়েছিল এবং তার বান্ধবীকে একটা আইসক্রিম সোডা কিনে দেওয়ার মতো পয়সা তার পকেটে থাকত না। ক্লাসের অন্যান্য ছেলেরা তাচ্ছিল্য করে পাত্তা দিত না। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, খ্যাতি অর্জন করতে হবে এবং কীভাবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা যায় তার সোজাপথ খুঁজতে লাগলেন। তিনি স্কুলের গ্লি ক্লাবের সদস্য হতে চাইলেন এবং নাটকে অভিনয় করতে চাইলেন কিন্তু তারা তাকে নিল না। অথচ এই বালক যিনি কিনা ক্যালিফোর্নিয়ার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গায়ক হিসেবে খ্যাতিলাভের জন্য ভাগ্য কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে আছেন, তিনি স্কুলের একটা কনসার্টে গান গাইতে চাইলে নিদারুণভাবে প্রত্যাখ্যাত হন। অবশ্য তার বয়স একুশ হওয়ার আগে তার কণ্ঠস্বরে প্রতিভার ফুলিঙ্গ স্ফুরিত হয় নি। তার গাওয়া পর্যন্ত যত গান লেখা হয়েছে তার মধ্যে 'দ্য এন্ড অব এ পারফেক্ট ডে' একটি অন্যমত শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় গান। বিশ্বের পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি লোক এই গানের রেকর্ড কিনেছেন এবং লরেন্স টিবেট বলেন যে, এই সাধারণ গানটা ছিল সত্যিই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

লর্ড বায়রন : মানুষের মাথার খুলিতে করে মদ পান করতেন

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম লগ্নে একজন আদর্শ প্রেমিক কেমন ছিল, কী ধরনের পুরুষ আমাদের দাদি নানিদের বুকে দুপদাপ সৃষ্টি করত আর উনুনের পাশে বসা দাদা-নানিদের ঈর্ষান্বিত আশঙ্কায় বুকের ভিতর মোচড় মারত কোনো নারীরা? কারা ছিল সেদিনের ডন জুয়ান, ভ্যালেন্তিনো, ক্লার্ক গেলব? উত্তরটা সহজ। তখনকার দুনিয়াতে এমন কোনো খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিল না যে কি না মহিলাদের ব্যাপারে ভাবপ্রবণ জর্জ গর্ডন, লর্ড বায়রন-এর পাশে দাঁড়াতে পারত।

আপনারা জানেন লর্ড বায়রন ছিলেন তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কাব্যগ্রন্থের প্রভাবে সমসাময়িক সাহিত্য অঙ্গনের সকল প্রবণতা বদলে গিয়েছিল! তার সাহিত্য রচনা ছিল আবেগময় ও স্বতন্ত্র। বায়রনের জীবনটাও ছিল বৈচিত্র্যময়। ডজন ডজন সুন্দরী মহিলার সাথেও প্রেম করেছেন। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে বায়রন তার নিজের সৎবোনের সাথেও প্রেমে লিপ্ত হয়েছেন। যে প্রেমের। অপবাদ সমস্ত ইউরোপকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। আর এতে তছনছ হয়েছিল জীবনটা। বোনের প্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর তার উদ্দেশ্যে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনা করেছেন। তার ক'টা লাইন হচ্ছে

যদি আবার পাই গো তোমার দরশন
অনেক বছর পরে,

কেমন করে করবো তোমায় সম্ভাষণ
নীরবতায় নিবিড় অশ্রু নীড়ে।

বায়রনের নামে কুৎসা রটানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রেমিকার সংখ্যাও বেড়ে গেল দারুণভাবে, অগণিত মহিলারা বিমুগ্ধ হয়ে গভীরভাবে তাকে ভালোবাসতে থাকে। অবশেষে মহিলাদের প্রেমের অত্যাচার আর তার বর্বরতা সহ্য করতে না পেরে বায়রনের স্ত্রী তাকে তালাক দিয়ে চলে যান। তখন ইউরোপের মহিলারা প্রকাশ্যে বায়রনের নিন্দা করতে লাগল। এই মহিলারাই তাকে প্রেমপত্র, চুলের গোছা ও নানা উপঢৌকন দিয়ে অভিভূত করেছিল।

একবার এমন হয়েছিল : এক অভিজাত পরিবারের সুন্দরী মহিলা বায়রনকে প্রেম নিবেদন করার জন্য এবং তার নাগাল পাওয়ার জন্য বালকের ছদ্মবেশ ধরেছিল। তার প্রেমে পাগল হয়ে আরেক মহিলার মাথা এমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে তিনি ইংল্যান্ড থেকে ইতালি পর্যন্ত পুরো রাস্তা তার পিছু নিয়ে এমনভাবে চেপে ধরলেন যে বায়রনকে হার মানতে বাধ্য হতে হল।

এই মহা কুলাদর্শ প্রেমিক কেমন ছিলেন? স্বভাবতই এই প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগবে। তিনি কি সুদর্শন ছিলেন? মোটেই না। তিনি বিশ্রীভাবে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন, একটা পা ছিল বিকৃত। তিনি আঙুলের মুখে নখ চিবোতেন, তামাক চিবোতেন। এ রকমের কতকগুলো বদস্বভাব ছিল তার। একজন গুণ্ডা প্রকৃতির লোকের মতো ব্রিটেনের রাজপথে গুলিভরা পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তার মেজাজ ছিল তিরিক্ষি। কোনো লোক যদি তার চোখের দিকে তাকাত তা হলে বায়রনের রক্তচাপ অসম্ভব রকম বেড়ে যেত, কারণ তার ধারণা যে লোকটি তার বিকৃত পায়ের দিকে তাকিয়েই উপহাস করছে।

বিখ্যাত কবি লর্ড বায়রনকে রোমিও বলে অভিনন্দিত করা হত। তিনি মহিলাদের ওপর অত্যাচার করতে ভালোবাসতেন। তার বিয়ের দু-ঘণ্টা পরেই নববধূকে তার মনের জঘন্য ইচ্ছেটা জানিয়ে দিলেন যে, তিনি তাকে ঘৃণা করেন এবং ঘৃণার বশেই তাকে বিয়ে করেছেন। আরো বলেছেন, নববধূ যখন তার সঙ্গে প্রথম দেখা করবেন তখন তাকে অনুশোচনা ও দুঃখ পেতে হবে এবং তিনি করেছিলেনও তাই। তাই তাদের দাম্পত্যজীবনের অঙ্গীকারপত্র মাত্র একটি বছর টিকে ছিল। অবশ্য স্ত্রীর গায়ে হাত তোলেন নি কিন্তু ঘরের আসবাবপত্র ভেঙে তছনছ করতেন এবং প্রেমিকাঁদের বাসায় নিয়ে আসতেন। অবশেষে তার স্ত্রী ভাবলেন যে তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তিনি বাড়িতে ডাক্তার ডাকতে বাধ্য হলেন। তার বাড়ির পাশ্ববর্তীর ভাষ্য ছিল যে–তার সমস্ত ভৃত্য ছিল যুবতী মেয়ে–সুন্দরী এবং মিষ্টস্বভাবের। ওই সমস্ত যুবতী চাকরানিরা বায়রন ও তার বন্ধুবান্ধবদেরকে মানুষের মাথার খুলিতে মদ্য পরিবেশন করে আনন্দ দিত। খুলিগুলোকে ঘষে মেজে ঝকঝকে তকতকে করে পান পত্রের উপযোগী করা হত।

বায়রনের চেহারা ছিল একহারা গড়নের। তার চামড়া এত সাদা ছিল যে তার প্রতি আসক্ত রমণীরা প্রশংসা করে বলত যে, তিনি একটা সুন্দর কারুকাজ করা প্রদীপ্ত অ্যালবাস্টারের পাত্র। কিন্তু রমণীরা জানত না যে, তার প্রতিটি মুহূর্ত ছিল শরীরের মেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও অবিরাম ক্লান্তিকর যুদ্ধ। তিনি একহারা সুদর্শন থাকার জন্য সর্বদা অদ্ভুত খাবার খেতেন।

তার খাবার ছিল অত্যন্ত অল্প পরিমাণের–দিনে একবার মাত্র ভিনেগার ছিটানো আলু বা ভাত। মাঝেমধ্যে রুচি পরিবর্তনের জন্য শুকনো বিস্কুট চিবোতেন এবং একগ্লাস সোডা পান করতেন। শরীরের মেদ কমানোর জন্য তিনি তরবারি যুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, ঘোড়ায় চড়া

এবং সাঁতারকাটা অভ্যাস করতেন। তার অদ্ভুত রকমের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি তার ক্ষিধে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিল যার ফলে তার ঘরবাড়ি পেটেন্ট ওষুধের গন্ধে ভুরভুর করত। এতে করে একজন বিশ্ববিখ্যাত প্রেমিকের মননামুগ্ধকর প্রেমনিকুঞ্জটাকে একটা ওষুধ বিক্রেতার দোকান বলে প্রতীয়মান হত।

তিনি ঘুমের ঘোরে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখতেন, তাই বিছানার পাশে দুটো গুলিভরা পিস্তল রাখতেন। আর রাতের নিস্তব্ধতায় চিৎকার করতে করতে ও দাঁত কিড়মিড় করতে করতে জেগে উঠতেন এবং পিস্তল হাতে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতেন। যে পুরানো বাড়িটাতে বায়রন রাত্রিকালে দুঃস্বপ্ন দেখতেন তাতে বহুদিন আগে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া এক সন্ন্যাসীর প্রেতাত্মা আগমন করত, যিনি একসময় ওখানে বাস করতেন। লর্ড বায়রন শপথ করে বলেছিলেন যে, ওই প্রেতাত্মাটা কালো আলখাল্লা পরে এসে ঘরের জানালা দিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত আর তারপর গম্ভীর ও ধীর পদেক্ষেপে হেঁটে হেঁটে চলে যেত।

একবার লর্ড বায়রন ইতালিতে এসে শপথ করে বলেছিলেন যে, তিনি বিখ্যাত কবি শেলির প্রেতাত্মাকে একটি জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছেন। সে সময়ে শেলি ছিলেন সেখান থেকে অনেক মাইল দূরে; বায়রন তা জানতেন। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এর অল্পকালের মধ্যেই কবি শেলি মারা গেলেন এক পাহাড়িয়াহ্রদের মধ্যে ঝড়ের কবলে ডুবে। ব্যথিত বায়রন অবশ্য নিজের হাতে চিতা প্রস্তুত করে শেলির মরদেহটাকে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। একসময় একটা অন্ধ কুসংস্কার পেয়ে বসেছিল বায়রনকে। এক যাযাবর গণকার তার রাশি নির্ণয় করে ভবিষ্যদ্বাণী করে তাকে সাবধান করে দিল যে, তিনি সাঁইত্রিশ বছর বয়সে মারা যাবেন। তার ছত্রিশতম জন্মদিনের তিনমাস পরেই বায়রন সত্যি সত্যিই মারা যান। তিনি বিশ্বাস করতেন, এক নিদারুণ অভিশাপ তার সমস্ত

পরিবারের উপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। তাই তিনি বলেছিলেন ছত্রিশতম জন্মদিনটা হল তার বংশের লোকদের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ। কোনো কোনো চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক তার এই কথার সাথে একমত হতেও প্রস্তুত; কারণ বায়রনের বাবা ছত্রিশ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন আর বায়রনের মেয়ে, যার জীবনটা ছিল ঠিক তার বাবার মতোই–তিনিও তার ছত্রিশতম জন্মদিনের ঠিক আগেই মারা যান।

লায়ানল ব্যারিমোর : নিজের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ পান নি

১৯১৮ সালের এক রজনীতে লায়ানল ব্যারিমোর আমেরিকার ব্রডওয়েতে অনুষ্ঠিত 'দ্য কপারহেড' এর মিল্ট শ্যাঙ্কের চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন, সে রাত্রে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এটা ছিল একটা চমৎকার অনুষ্ঠান, একটা মহাবিজয় যা নাট্য জগতে এক অদৃশ্যপূর্ব ঘটনা ও ইতিহাসের অবতারণা করেছিল। অনুষ্ঠানের রোমাঞ্চিত দর্শকবর্গের অনুরোধে এক অভিনেতাকে প্রায় পনের বার পর্দার সামনে এসে মুখ দেখাতে হল, আর প্রতিবার দর্শকদের উত্তেজিত উল্লাসে ফেটে পড়ল থিয়েটার হলটি। যার তাৎপর্যপূর্ণ অবদান ব্রডওয়ের থিয়েটার হলের সে অনুষ্ঠানটিকে পরিপূর্ণ সার্থকতা দান করেছিল তার নাম 'লায়ানল ব্যারিমোর।

এ ঘটনার পনের বছর পর এই শক্তিমান অভিনেতার বড় হওয়ার অপরিসীম সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠালাভের ইতিহাস সম্পর্কে জানার অবকাশ হয়েছিল আমার। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম ব্রডওয়ের অভিজাত বারিমোর পরিবারের এই সুদর্শন ব্যক্তিটিকে জীবনে আকাঙ্ক্ষিত স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কোনো সংগ্রাম করতে হয় নি। আসলে আমার ধারণা ছিল ভুল। আমার এক প্রশ্নের জবাবে তিনি স্বাভবসিদ্ধ গুরুগম্ভীর স্বরে বলেছেন, একটা মানুষকে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ ও খ্যাতির স্বর্ণ-শিখরে উঠতে হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হয়। তবে তা হল সাধনা আর একাগ্রতার ব্যাপার।

লায়ানল ব্যারিমোরের শৈশবকালটা বেশ অদ্ভূত ও এলোমেলো ধরনের ছিল! তার বাবা মরিস ম্যারিয়োর ছিলেন অসামরিক ও আকর্ষণীয় স্বভাবের ব্যক্তি যিনি তার বেপরোয়া আচরণের দরুন রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে ইতিহাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ছিলেন একজন অসামরিক এবং রুচিশীল মানুষ। অদ্ভুত সৌন্দর্যপিপাসু ছিলেন তিনি এবং সৌন্দর্যপিপাসার বহিপ্রকাশ ঘটানোর জন্য তিনি শেষ পেনিটিও ব্যয় করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। অন্য কোনো দেশ বা শহরে ভ্রমণে গেলে জাহাজে করে নানা ধরনের পশুপাখি যেমন ভালুক, বানর, বনবিড়াল, বিভিন্ন ধরনের পাখপাখালি ও নানা ধরনের কুকুর নিয়ে দেশে ফিরতেন। এক বছর স্টেটাস দ্বীপের এক শস্যখামারে গ্রীষ্মকাল কাটান তিনি এক বন্ধুর সাথে। সেখানে একজন নিগ্রো চাকর এবং বিভিন্ন জাতের ও আকারের পঁয়ত্রিশটি কুকুর ছাড়া আর আর কোনো সঙ্গী ছিল না। ব্যারিয়োর পরিবারের তিন বিখ্যাত অভিনেতা লায়ালন ব্যারিমোর, জ্যাক ব্যারিমোর এবং এথেল ব্যারিমোর 'রাসপুটিন এবং সম্রাজ্ঞী' ছবিতে একত্রে আত্মপ্রকাশ করেন যা হলিউডের জন্য একটা গর্বের বিষয় ছিল।

লায়ানল ব্যারিমোর কিছুদিন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে গিয়ে শিল্পকলা সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছেন। তার আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ ছিল একজন শিল্পী হবার। একজন মঞ্চ ও চিত্রতারকা হবার আশা তিনি কখনো পোষণ করতেন না।

জীবনের কোনো কোনো সঙ্কটময় মুহূর্তে কপর্দকহীন এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায়ও থাকতে হয়েছিল তাকে। কখনো তার স্কেচগুলো পত্রিকাওয়ালাদের কাছে বিক্রি করতে পারতেন না। অবশ্য যে কোনো সময় বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম করে টাকা আনাতে পারতেন; কিন্তু

মাঝে-মাঝে টেলিগ্রাম করার মতো পয়সা-কড়ি থাকতো না তার হাতে। গ্রিনউইচ গ্রামের এক প্রান্তে অংশীদারী মালিকানায় একটা ছোটখাটো স্টুডিও ছিল তার। স্টুডিওর আসবাব সামগ্রী কিনে এটাকে উন্নত করার মতো অর্থ তখন তার ছিল না। থাকার মতো একটা বিছানাও ছিল না বলে মেঝের ওপর ঘুমুতে হত। আর যখন খুব শীত পড়ত, তখন বড় বড় বইপত্র দিয়ে শরীর ঢেকে রাখত। তাদের সাথে থাকত এক ছোঁকরা লেখক-তার একটা সোনার দাঁত ছিল। যখন হাত একেবারে খালি হয়ে যেত, তখন ঐ দাঁতটা দোকানে বন্ধক রেখে টাকা সংগ্রহ করত তারা।

মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে লায়ানল ব্যারিমোর একজন পাকাঁপোক্ত তারকা হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এটা ব্রডওয়েবাসীদের জন্য এক গৌরবের বিষয় ছিল। তার ভাই জন যিনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ব্যয়বহুল তারকা ও বোন এথেল তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্কের একটা রঙ্গমঞ্চকে তার নামে নামকরণ করেছিলেন।

তেপান্ন বছর বয়সে লায়ানল ব্যারিমোর তার তিরিশ বছরের লব্ধ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সমন্বয় সাধন করে চিত্র পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি যথেষ্ট পড়াশোনা করতেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। ব্যারিমোরই ছিলেন প্রথম চিত্র পরিচালক যার ছায়াছবি তৈরির ব্যাপারে ব্যবহৃত শব্দগ্রহণকারী যন্ত্রটি সবদিকে ঘোরানো যায়। এটা এমন একটা আবিষ্কার যা সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণে বিপ্লবাত্মক অধ্যায়ের সৃষ্টি করল। তিনি লরেন্স ট্রিবেট ও বারবারা স্টানউইক-এর মতো অবিস্মরণীয় চিত্র পরিচালনা করে চিত্রশিল্প জগৎকে পূর্ণতা অর্জনে সহায়তা করেছিলেন।

বয়স যখন তেপান্ন তখন ব্যারিমোর বিশ্বাস করলেন যে, তার অভিনয় করার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তখন তিনি মনস্থির করলেন যে, জীবনের বাকি দিনগুলো চিত্র পরিচালনা করেই কাটিয়ে দেবেন। ঠিক সে সময় আরেকটা সুযোগ এল তার অভিনয় ক্ষমতা প্রদর্শনের। নরমা বিয়ারার 'এ ফ্রী সোল' নামে একটা ছবি তৈরি করছিলেন। এতে বাবার চরিত্রে অভিনয় করার জন্য একজন দক্ষ অভিনেতার অভিনয় করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়ালেন লায়ানল ব্যারিয়োর আর তার স্বকীয় অভিনয় ক্ষমতার দ্বারা বাস্তবভাবে ফুটিয়ে তুললেন চরিত্রটি। তার এই গৌরবময় অভিনয়ের জন্য তিনি একাডেমী অব মোশন পিকচার আর্টস এন্ড সায়েন্স' নামক সম্মানিত পদক লাভ করলেন। এরপর একে একে সাফল্য এসে লুটিয়ে পড়তে লাগল তার পায়ের তলায়। তৈরি হলো তার অভিনয় সমৃদ্ধ 'দ্য ইয়েলো টিকেট', 'মাতাহরি গ্রান্ড হোটেল', 'রাসপুটিন অ্যান্ড দ্য এমপ্রেস' এবং 'এ ওয়াইল্ডারনেস' নামক বিখ্যাত ছবিগুলো।

লায়ানল ব্যারিমোর বলেছেন, সমস্ত জীবনটাই আমি একবার উঠেছি একবার নেমেছি। কেউ-কেউ বলেছেন, আমি ফুরিয়ে গেছি, আমার আর চিত্র জগৎকে দেবার মতো আর কিছু নেই–কিন্তু এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার মতো অবকাশ আমার কখনো হয় নি। আসলে আমি সবসময় এত বেশি ব্যস্ত থাকতাম যে, নিজের দুঃখকষ্ট নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার মতো সময় আমি কখনো পাই নি।

লিও টলস্টয় : জীবনবাদী লেখক

এবারে এক অবিশ্বাস্য জীবনকাহিনী শুনুন যা আরব্যউপন্যাসের মতো রোমহর্ষক। এটা হল এমন একজন প্রাতঃস্মরণীয় ও বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব যাকে এক পলক দেখার জন্য, যার গলার সুমিষ্ট স্বরটা একটিবার শোনার জন্য ও তার পোশাকের প্রান্তভাগ একবার ছুঁয়ে দেয়ার জন্য তাঁর অগণিত ভক্তরা তাঁর বাড়িতে অনবরত যাতায়াত করত–তিনি লিও টলস্টল।

তার জীবনকাহিনী যে-কোনো উপন্যাসের মতোই বর্ণাঢ্য। জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিয়াল্লিশ কামরাবিশিষ্ট ঐশ্বর্য পরিবেষ্টিত এক সুরম্য প্রাসাদে। আর লালিতপালিত হয়েছেন প্রাচীন রুশ আভিজাত্যের বিলাসিত পরিবেশে। যৌবনে তিনি ছিলেন একজন বিলাসী যুবক-সুন্দর ভঙ্গিমায় পদচালনা করতেন এবং কথা বলতেন, মস্কোর দর্জির দোকানে অনেক অর্থ খরচ করতেন। যৌবনে মদ খেতেন, মারামারি করতেন, অনেক জঘন্য পাপ কাজ এমনকি খুন-খারাপি করতেন। তাঁর নিজের কথায় একটা নোংরা পাপময় জীবন যাপন করতেন। কিন্তু যিশুর শিক্ষা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে পরবর্তীতে সমস্ত রাশিয়ার খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সবচেয়ে ধর্মীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিতে পরিণত হন। যৌবনে তিনি কলেজে অকৃতকার্য হন। এবং তার গৃহশিক্ষকরা তার মাথায় বিদ্যে ঢোকাবার আশা ত্যাগ করেন। কিন্তু তিনিই ত্রিশ বছর পর পৃথিবীর দুটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লিখে বিখ্যাত হয়ে গেলেন, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অমরগাথা হয়ে থাকবে। উপন্যাস দুটো হল–ওয়ার এন্ড পিস', ও 'এনা কারেনিনা। বন্ধুরা তাঁর বাড়িতে এসে একাধারে দীর্ঘদিন থেকে টলস্টয়ের সব কথা

সাঁটলিপিতে লিখে নিত। তাঁর দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি ঘটনা সুবিস্তারিতভাবে তারা বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে এসব বিবরণী বড় বড় পুস্তকাকারে ছাপা হয়েছে।

লিও টলস্টয় এবং তার চিন্তাধারা সম্পর্কে ২৩,০০০ বই এবং সাময়িকী ও খবরের কাগজে ৫৬,০০০ প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। তাঁর লেখা গ্রন্থাদির পরিমাণ ছিল একশত খণ্ড।

বিবাহিত জীবনে প্রথম কয়েকটি বছর তিনি ও তার স্ত্রী এত সুখী ছিলেন যে তারা সবসময় নতজানু হয়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে আনন্দময় জীবন সুখময় ও দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতেন। কিন্তু বেশ ক'বছর পরে তারা হয়ে গেলেন চরম অসুখী। তিনি পরে তার স্ত্রীর মুখ দর্শনেও ঘৃণাবোধ

করতেন এবং তার অন্তিম ইচ্ছে ছিল তার স্ত্রীকে যেন তাঁর সামনে আসার অনুমতি না দেয়া হয়।

টলস্টয়ের জীবনটা ছিল একটা ট্রাজেডি আর এই ট্রাজেডির কারণ হল তাঁর স্ত্রী। তাঁর স্ত্রী ধনসম্পদ, খ্যাতি ও বিলাসিতা পছন্দ করতেন কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে ধন-সম্পদ এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি হল একটা পাপস্বরূপ। তাঁর স্ত্রী বিশ্বাস করতেন শক্তির শাসনে আর তিনি বিশ্বাস করতেন ভালোবাসার শাসনে।

টলস্টয় সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে প্রাচীন রাশিয়ার জার সম্রাটদের চেয়েও বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি তার বিখ্যাত উপন্যাস দুটো রচনার জন্য লজ্জিত হয়েছিলেন এবং অবশিষ্ট জীবন শান্তি, ভালোবাসা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের কাজে বাণীপূর্ণ পুস্তিকা প্রণয়নের ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পুস্তিকাগুলো সুলভ সংস্করণে ছাপানো হয়েছিল এবং গরুর গাড়ি

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

ও রেলগাড়িতে করে বয়ে নিয়ে ঘরে-ঘরে বিক্রি করা হয়েছিল। এ-সব পুস্তিকা চার বছরে ১,২০,০০,০০০ কপি বিক্রি ও বিতরণ করা হয়।

বয়সকালে টলস্টয় একজন সাধারণ কৃষকের মতোই সাদাসিধে কাপড় পড়তেন। নিজ হাতে নিজের জুতো তৈরি ও বিছানাপত্র সাজাতেন, ঘরদোর ঝাঁট দিতেন এবং একটা সাধারণ ও আবরণহীন টেবিলে কাঠের বাসন থেকে কাঠের চামচ দিয়ে খাবার তুলে খেতেন।

টলস্টয়ের বয়স যখন বিরাশি তখন ঘরের করুণ অশান্তি আর সহ্য করতে না পেরে এক বুক জ্বালা নিয়ে হতাশ মনে ১৯১০ সালের ২১শে অক্টোবর রাত্রিবেলায় স্ত্রীর কাছ থেকে অন্ধকার ও প্রচণ্ড শীতের মধ্যে পালিয়ে এলেন। তার এগারোদিন পরে এক রেল স্টেশনের একটি ছোট কামরায় তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন কৃষক পরিবেষ্টিত হয়ে। মৃত্যুকালে তিনি বলেছিলেন, ‘ঈশ্বর সব কিছুর ব্যবস্থা করবেন।‘ তাঁর শেষ বাক্য ছিল, ‘সবসময় কেবল খুঁজেছি।‘

শিক সেল : একটি বইয়ের জনপ্রিয় লেখক

পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ একজন মাত্র লেখকই আছেন যিনি একটা বই লিখে তার প্রতিটি শব্দের জন্য সাড়ে উনপঞ্চাশ ডলার করে পেয়েছেন। বইটা হল, 'দ্য স্পেশালিস্ট' তার লেখকের নাম হল শিক সেল। তার লেখা বইগুলোর মধ্যে দ্য স্পেশালিস্টই প্রথম আর এই বইটার ওপর তার আস্থা এত কম ছিল যে বিকাশ তিনি এটা মাত্র দু'হাজার কপি ছাপান। কিন্তু এই কপিগুলো বিক্রি হতে মাত্র দু'সপ্তাহ লেগেছিল। বইটা সৌভাগ্যবশত হঠাৎ করে সবার মন কেড়ে নিয়েছিল। পাইন বনের মধ্যে আগুন লাগলে যেমন লাফাতে লাফাতে ছড়িয়ে পড়ে তেমনি করে এর প্রচার ও লেখকের সুখ্যাতি সারা দেশেময় ছড়িয়ে পড়ল। দ্যা গুড আর্থের চেয়েও এটার বেশি কপি বিক্রি হল। কিন্তু এটা লেখার জন্য শিক সেল গর্ববোধ তো করেনই নি বরং দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, এই জন্য যে অনেক পাঠক এর কৌতুক ও পরিহাসটা ভুল বুঝেছিলেন। তার উপস্থিতিতে কেউ বইটা নিয়ে আলোচনা করলে তিনি অত্যন্ত ব্রিত বোধ করেন। একবার তার মেয়ে তো কেঁদেই ফেলেছিল, কারণ সে মনে করেছিল যে বইটা পরিবারের সম্মানের হানি করেছিল।

তার লেখক হওয়ার বিষয়টি ছিল আকস্মিক। আসলে তিনি ছিলেন একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। তার অভিনেতা হওয়াটাও ছিল আকস্মিক ব্যাপার। তারো আগে তিনি ছিলেন করিগর, ইলিনয়ের আর্বোনতে রেলরাস্তার পাশের দোকানে তিনি কাজ করতেন। পরিবারের বড় বোনটির ছিল অভিনয় করার সখ, সে অভিনয় শেখার স্কুলে পড়াশোনা করত। সে বড়দিনের ছুটিতে বাড়ি এল এবং এক গির্জায় অনুষ্ঠান প্রদর্শন করল। অনুষ্ঠান শেষ হলে শিক সেল বললেন, আরে, এটা তো আমি স্কুলে না গিয়েই শিখতে পারি। তার

বোন তাকে বলল যে, যদি সে তা পারে তবে দেখাক না কেন। ব্যস, তিনি মঞ্চের মাঝখানে গিয়ে স্থানীয় টেলিগ্রাফ অপারেটরের অনুকরণ করে অভিনয় শুরু করে দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গ্রাম্য লোকগুলি তার অভিনয় দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ল আসন থেকে। রঙ্গমঞ্চের ম্যানেজার তাকে নিয়োগ করে নিলেন, সাপ্তাহিক দশ ডলার হিসেবে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করলেন। এতে শিকের সমস্ত জীবনটাই পালটে গেল। তারপর তিনি শিকাগোর দিকে ছুটলেন, মঞ্চে একটা চাকরি নিলেন এবং কীভাবে লোককে চমক লাগানো যায় তার মহড়া দিতে থাকলে তার বেতন ছিল অত্যন্ত কম, তাই তার কাছে প্রতিটি পেনিও ছিল মূল্যবান। অবশ্য তারপর নিজের অধ্যবসায় ও ঐক্যান্তিক আগ্রহ তাকে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান এনে দিয়েছিল। তিনি হোটেলের জিনিস খেতেন না, তাই যেখানেই যেতেন সাথে করে একজন বাবুর্চি নিয়ে যেতেন। তার সাথে একট স্টিলের ট্রাঙ্কও থাকত, ট্রাঙ্কটাকে তিনি হাজার হাজার কৌতুকের পুস্তিকা রাখার আলমারিতে পরিণত করেছিলেন। তিনি ব্রডওয়ের ছয়টি সঙ্গীত নাটকে অভিনয় করেন। তিনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত হর্নপ্লেয়ার। কিন্তু নিজে হর্ন বাজাতে পারতেন না। তিনি প্যারিস সম্পর্কে লেখা নাট্য প্রদর্শনীতে অভিনয় করে পঞ্চাশ হাজার ডলার উপার্জন করেছিলেন; কিন্তু জীবনে কখনো প্যারিস দেখেন নি। 'দ্য স্পেশালিস্ট' বইটি রচনা করে তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থোপার্জন করলেন আর তা দিয়ে আরেকটা বই লিখলেন, তার নাম 'দ্য কর্ন হাস্কার ক্রেশিজ দ্য মোভিয়া'। নাট্যমঞ্চে হাজার দর্শকের সামনে দাঁড়াতে তিনি ভয় লজ্জাবোধ করতেন না; কিন্তু প্রেমিকার কাছে প্রথম বিয়ের প্রস্তাব করার সময় তিনি তোতলাতে শুরু করে দিলেন।

সমারসেট মম্ : একজন বিশ্বখ্যাত লেখকের নেপথ্য কথন

একসময়ে নিউইয়র্কের শীর্ষ নাট্যসমালোচকেরা সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দশটি নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে গোপন ব্যালটে ভোট দিয়ে তাদের অভিমত ব্যক্ত করল, তাতে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে তিন শো বছরেরও আগে লেখা একটি পুরনো নাট্যলেখ্য 'হ্যামলেট' আর দ্বিতীয় হয়েছিল অপর একটি নাটক যার নাম–'রেইন'। হ্যাঁ, দক্ষিণ সাগরের উদ্দাম ও ভয়ঙ্কর ঝড়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা এ নাটক–যাতে আছে যৌনতা ও ধর্ম এবং সাগরের হিংস্র থাবার মতো ক্ষত-বিক্ষত করা প্রগাঢ় চেতনা! নাটকটি বিরচিত হয় বিখ্যাত সাহিত্যিক সমারসেট মমের একটা ছোটগল্পের ওপর ভিত্তি করে। 'রেইন' রচনার জন্য সমরসেট মম্ পেয়েছিলেন দু'লক্ষ ডলার; কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল নাটকটি লিখতে নাকি পাঁচ মিনিট সময় ব্যয় করা হয় নি। ব্যাপরটা ঘটেছিল এভাবে, মম্ 'স্যাডি টমসন' নামে একটা ছোটগল্প লিখেছিলেন। এটা নিয়ে তেমন আর মাথা ঘামান নি। একরাতে কোল্টন নামে তার এক বন্ধু বেড়াতে এলেন মমের বাসায়। শোবার সময় কোল্টন একটা কিছু পড়ে ঘুম আসার পূর্বপর্যন্ত সময় কাটাতে চাইলেন। মম্ তাকে 'স্যাডি টমসনের' পাণ্ডুলিপি পড়তে দিলেন। তাতে গল্পটা তার অসম্ভব রকমের ভালো লেগে গেল। তিনি রোমাঞ্চিত হয়ে ঘরময় পায়চারী শুরু করলেন, আর কল্পনায় গল্পটাকে নাটকরূপে দেখলেন যেটার ভাগ্যে ছিল অমরত্ব। সারারাত না ঘুমিয়ে পরদিন সকালে মমকে জানালেন যে গল্পটাকে একটা চমৎকার নাট্যরূপ দেয়া যেতে পারে।

কিন্তু সমারসেট মম্ এতে চমৎকৃত হলেন না বরং নিরুৎসাহ হয়ে স্পষ্টবাদী ব্রিটিশ কণ্ঠে ব্যক্ত করলেন এটা ব্যাধিগ্রস্ত একটা নাটক হতে পারে, প্রকৃতপক্ষে গ্রাহ্য করার মতো তেমন কিছু নয়।

কিন্তু বস্তুতপক্ষে যে নাটককে গ্রহণ করার মতো কিছু নয় বলে মম্ মনে করলেন অবশেষে তা-ই তাকে এনে দিল দু-লাখ ডলার। এ নাটক লেখার পর বেশ কয়েকজন প্রযোজক তা প্রত্যাখান করেন। তারপর মেম হ্যারিস নামে এক নাট্যকার এটা গ্রহণ করলেন এবং তিনি ইঙ্গেলস নামী এক তরুণী উঠতি অভিনেত্রীর জন্য স্যাডি টমসনের চরিত্রটি মনোনীত করলেন।

অবশেষে এই চরিত্রে বলিষ্ঠ ও প্রাঞ্জল অভিনয় করে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে যশস্বী হলেন। আর অভিনয়ে এ নাটক ব্রডওয়ের মঞ্চে ৪১৫ রজনী প্রদর্শিত হল।

সমারসেট মম্ বেশ কটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, তন্মধ্যে অফ হিউম্যান বণ্ডেজ, দ্য মুন এ্যাণ্ড সিক্স পেন্স এবং দ্য রেজাস্ এজ অন্যতম। কিন্তু তার সব চেয়ে বিখ্যাত নাটকটিই লেখেন নি তিনি। তাকে অভিহিত করা হয় একজন ক্ষণজন্মা ও প্রতিভাময় সাহিত্যিক হিসেবে। অথচ এই যশস্বী লেখকের জীবনের প্রথম অধ্যায় তিনি হতাশা, বঞ্চনা ও দারিদ্রতার অন্ধকার বলয়ে নিপতিত কখনো না খেয়েও থাকতে হয়েছে তাকে। জীবনের এগারোটি বছর আয় ছিল যার মোটে পাঁচশ' ডলার, পরে সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ উপার্জিত হতে থাকল বছরে লাখ লাখ ডলার। আর সঙ্গে-সঙ্গে এসেছিল যশখ্যাতি। তিনি পত্রিকাতে একটা সম্পাদকীয় লেখার চাকুরি নিতে চেয়েছিলেন, পান নি। সেই ক্ষোভ আর হতাশার জন্যই, তাঁর ভাষায়, তাকে অবিরত লিখে যেতে হল যা তাকে এনে দিল বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

মম্ চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছেন। তার বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন তাকে ওষুধের ব্যবসা চালানোর। কিন্তু সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে নিজের নামটি সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং সাহিত্যের পাতায় নাম লেখানোর অদম্য স্পৃহা তাকে নিরত করতে পারল না।

একবার লন্ডনের এক লেখকের একটি নাটক মঞ্চে ফ্লপ করল। নাট্যশালার কর্মকর্তা ঠিক 'হিট' করার মতো নয় অথচ চলনসই একটি নাটক খুঁজছিলেন। ডেস্ক হাতড়াতে হাতড়াতে পেয়ে গেলেন সমারসেট মম এর 'লেডি ফ্রেডারিক'। নাটক হিসেবে এটা তেমন যুৎসই ও উপযুক্ত নয় বিধায় তিনি তা ড্রয়ারে রেখে দিলেন এক বছর। কিন্তু নাটকটি মঞ্চ করার সঙ্গে সঙ্গে এক অবিশ্বাস্য অলৌকিক ব্যাপার ঘটে গেল, লেডি ফ্রেডারিক অসাধারণ মঞ্চসাফল্য অর্জন করে সারা লন্ডনে একটা হইচই ঘটিয়ে দিল। অস্কার ওয়াইল্ডের ঝকঝকে সংলাপের পর এমন আর নাটক ইংল্যান্ডবাসীকে এত সন্তুষ্ট করতে পারে নি।

ঠিক এর পরপরই লন্ডনের প্রতিটি নাট্যগোষ্ঠী থেকে নাটক উপহার দেয়ার জন্য সমারসেট মম-এর কাছে মুহুর্মুহু আবেদন আসতে লাগল। আর তিনি তাঁর লেখনীতে বোঝাই ডেস্ক খুঁজে খুঁজে পুরনো পাণ্ডুলিপিগুলো বের করতে থাকলেন; দু-এক সপ্তাহের মধ্যে তার বেশ ক'টি নাটক লন্ডনে আঁকজমকপূর্ণভাবে প্রদর্শিত হল এবং সফলতা ও খ্যাতি অর্জন করল। এর ফলে জোয়ারের জলের মতো রয়্যালটির স্বর্ণরাশি আসতে থাকল তার দুয়ার প্রান্তে। অবশেষে শুরু হয়ে গেল মম্-এর লেখার গ্রন্থের জন্য প্রকাশকদের মধ্যে উচ্চতর দর কষাকষির প্রতিযোগিতা। সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে নিয়ন্ত্রণ আসতে থাকল অজস্র।

মম্-এর লেখার পদ্ধতি ও স্বভাব ছিল ভিন্নতর। বিকেলে কিছু লেখার জন্য মস্তিষ্ক একটুও কাজ করত না। কোনো লেখা শুরু করার আগে সবসময় ঘণ্টাখানেক পাইপে ধূমপান করতেন এবং দর্শন শাস্ত্র পড়তেন। তারপর লিখে যেতেন অনর্গল।

এভাবে সমারসেট মম্ তাঁর সাহিত্যসাধনা ও বুদ্ধিদীপ্ত লেখনীর মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্য অঙ্গনে নিজ আসনটি প্রতিষ্ঠিত করলেন খ্যাতির শীর্ষস্থানে, বরণীয় হলেন মর্যাদাসম্পন্ন লেখক হিসেবে। তাঁর লেখনী চলমান বিশ্বের সাহিত্যানুরাগী পাঠকসমাজের জন্য রেখে গেল অপূর্ব নজির।

সিনক্লেয়ার লুইস : তিনি নোবেল বিজয়ী হলেন

সিনক্লেয়ার লুইসের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হল আজ থেকে বেশ কয়েকবছর আগে। তিনি, আমি এবং আরো কয়েকজন লং আইল্যান্ডের ফ্রিপোর্টে মোটর বোট নিয়ে উইক-মাছ ধরার জন্য জলের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। ঐ সময় আমি টুপি খুলে রেড লুইসকে অভিবাদন জানিয়েছি কারণ তিনি কখনো সমুদ্র পীড়ায় ভুগতেন না। সমুদ্রের ঢেউ প্রবল বেগে নৌকাটাকে আন্দোলিত করত আর আমি টাল সামলাতে

পেরে পাটাতনে আছড়ে পড়তাম, কিন্তু দেখেছি, লুইস পটে আঁকা ছবির মতো স্থির বসে থেকে মাছ ধরতেন। আজো আমি সিনক্লেয়ার লুইসের উদ্দেশ্য টুপি খুলে সম্মান জানাই শুধু একজন মৎস্য শিকারী হিসেবে তার দক্ষতার জন্য নয়, অবিরাম ধারায় অনেকগুলি চমকপ্রদ ও অমর উপন্যাস লেখার জন্য। আর আপনি যদি ভাবেন এটা আবার একটা বাহাদুরী হল নাকি? তাহলে আপনিও একবার একটু চেষ্টা করে দেখুন।

সিনক্লেয়ার লুইস প্রথম সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন ১৯২০ সালে। এর আগে তিনি ছয়টি উপন্যাস রচনা করেছিলেন কিন্তু জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হননি। তাঁর সপ্তম উপন্যাস 'মেইন স্ট্রিট' সমগ্র জাতির ওপর দিয়ে একটা প্রবল টর্নেডোর মতো বয়ে গেল। মহিলা সংগঠনগুলি তাঁকে অকাট্য ভাষায় বকাবকি করল, ধর্মযাজকরা এটাকে নিন্দা করল এবং খবরের কাগজগুলো একযোগে এটাকে আমেরিকার জাতীয়জীবনের প্রতি চরম একটা অপমান বলে অভিহিত করল। এই উপন্যাসটি আমেরিকার সাহিত্য জগতে প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধিয়ে দিল। আর এর প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ল তিনি হাজার মাইল দূরে সুদূর ইউরোপে।

অবশেষে এই বইটাই তাকে একজন প্রথম সারির তারকায় পরিণত করে দিল। নিন্দুকেরা বলল, হয়েছে বটে চমৎকার, কিন্তু এই পুঁচকে ছোঁকরাটা আবার ওরকম করে লিখতে পারবে না মোটেও।

কিন্তু সেই লাল-মাথা ছেলেটা আবার লেখা শুরু করে দিলেন, আর তখন থেকেই আধডজন সবচাইতে বেশি জনপ্রিয় ও মূল্যবান উপন্যাস চটপট লিখে ফেললেন এবং সবাইকে অবাক করে দিলেন। অবশ্য চটপট বললে ভুল হবে কারণ তিনি অত্যন্ত সুচিন্তিত এবং ধৈর্য সহকারে তার পাণ্ডুলিপিগুলো সমাপ্ত করেন। তার মেইন স্ট্রিট' প্রকাশের সতের বছর আগে তা লিখতে আরম্ভ করছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল 'উডসওয়ার্থ র‍্যাবিট', 'এ্যারোস্মিথ, এলমার গাট্রি', এ্যান ভিকারস', 'ইট কান্ট হেপেন হিয়ার' ইত্যাদি।

আমি একবার তাঁর জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা বলতে বলেছিলাম। তিনি বলেছেন যে, যদি কোনো সাহিত্যকর্মে নিয়োজিত না থাকেন তাহলে তখন হয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রিক অথবা দর্শন শেখানোর কাজ নতুবা গভীর জঙ্গলে গিয়ে একদল করাতীর সাথে বসবাস করা তিনি পছন্দ করেন। বছরে ছয় মাস তিনি পার্ক অ্যাভিনিউতে কাটাতে ভালোবাসেন আর বাকি ছয় মাস ভারমন্ট পাহাড়ের একটা নির্জন স্থানে বসে কাটান। সেখানে তিনশত চল্লিশ একরের একটা আখচাষের খামার আছে তার। তিনি নিজের শাকসবজি সেখানে ফলান। শুধুমাত্র চুল কাটানোর প্রয়োজন হলে তিনি শহরে যান।

তাঁর মতে কারো বিখ্যাত হওয়াটা বড় বিরক্তিকর। তিনি আমাকে বললেন, যদি তিনি লোকদের সমস্ত চিঠির উত্তর দিতেন তা হলে তিনি আর কোনোদিনই আর একটা বইও

লিখতে সক্ষম হতেন না। শুধু তাই নয়, তা হলে তার ঘুমোবার সময়টাও ভাগ্যে জুটত না। তাই তিনি অধিকাংশ চিঠি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে সেগুলোকে পুড়ে যেতে দেখতেন। তিনি অটোগ্রাফপ্রার্থীদেরকে এড়িয়ে চলতেন। কদাচিৎ ভোজসভায় যেতেন এবং সাহিত্যিকদের আলোচনায় চা চক্র বর্জন করতেন।

আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম কীভাবে তিনি অনেক বছর প্রাতরাশের দুই ঘণ্টা আগে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে উনুন জ্বালাতেন, কফির পানি ফুটানোর জন্য চুলোয় কেটলি চড়িয়ে দিয়ে অবিরাম লিখে যেতেন। তিনি নিজের খাবার নিজেই রাঁধতেন, কাপড় ধুতেন এবং ছয় মাস যাবত দিন-রাত কাজ করতেন। এই ছ'মাসে তিনি একটিমাত্র জিনিস বিক্রি করলেন, তা হল দুই ডলারের বিনিময়ে একটি মাত্র কৌতুক। তিনি বলেছেন, তার যখন পেশায় হাতেখড়ি হচ্ছিল তখন ওই বছর ক'টিতে তার সময় যেমন কেটেছিল তেমনটি আর কখনো কাটে নি।

তাঁর লিখিতবইগুলোর কতকপি বিক্রি হয়েছে তা তিনি জানতেন না এবং তিনি কত উপার্জন করেছেন তারও হিসেব রাখতেন না।

তিনি সবরকমের অভিজ্ঞতাই অর্জন করতে সক্ষম হন! একবার তিনি গরু-ভেড়ার নৌকায় করে আটলান্টিক মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন। তিনি বধির বালকদের জন্য প্রকাশিত একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তিনি ছোটদের জন্য কবিতা লিখতেন এবং জ্যাক লন্ডনের কাছে কবিতার ও গল্পের প্লট বিক্রি করতেন। তিনি খেলাধুলার প্রতি তেমন আকর্ষণ বোধ করতেন না। এমনকি বিখ্যাত খেলোয়াড়দের দু একজনের বেশি তার নাম জানা ছিল না। একসময় সিনক্লেয়ার লুইস যে পত্রিকাগুলোতে কাজ করতেন তার প্রথম চারটাই তাকে

বরখাস্ত করেছিল। কোনো ব্যাপারে উপদেশ ও উৎসাহ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা তিনি বিশ্বাস করতেন না।

সাহিত্যে নেবেল পুরস্কার পেয়েছেন, এইখবর টেলিফোনে যখন তিনি পেলেন, তিনি তা বিশ্বাস করলেন না এবং হেসে উড়িয়ে দিলেন। তিনি ভাবলেন কেউ হয়তো তার সঙ্গে ঠাট্টা মসকরা করছে। অবশেষে তিনি যখন জানতে পারলেন তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন– তিনি সাহিত্য জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানলাভে সক্ষম হয়েছেন।

হাওয়ার্ড থার্স্টন : একজন বিখ্যাত জাদুকর

প্রায় বছরেরও আগের কথা। আলেকজান্ডার হারম্যন-এর জাদু দেখে খুশিমনে শিকাগোর এক থিয়েটার হল থেকে ভয়ানক শীতের রাতে দলে-দলে দর্শকরা বের হয়ে আসছিল। তখনকার সময়ের শ্রেষ্ঠ জাদুকর ছিলেন হারম্যন।

থিয়েটার হলেন সামনে এক বালক রাস্তায় দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ বিক্রি করছিল। তার গায়ে কোনো ওভারকোট ছিল না, ঘর বাড়ি ছিল না এবং থাকার মতো জায়গাও ছিল না। লোকজনের ভিড় কমে যাওয়ার পর থিয়েটার হলের পেছনে শুয়ে পড়ল, সে দেহটাকে প্রচণ্ড শীত থেকে রক্ষার জন্য একটা লোহার ঝাঁঝরির ওপর খবরের কাগজ দিয়ে শরীরটাকে জড়িয়ে নিল। শুয়ে থাকতে থাকতে এই বালক প্রতিজ্ঞা করল, সে একজন বড় জাদুকর হবে এবং ফারের কোট গায়ে জড়িয়ে জাদু দেখাবে, লোকজন হাততালি দিয়ে তাঁর প্রশংসা করবে। সে আরো প্রতিজ্ঞা করল, সে একজন বিখ্যাত জাদুকর হয়ে এ থিয়েটার হলে জাদু দেখাবে এবং বড় বড় হরফে তার নাম ছাপা হবে। এই বালকটির নাম হাওয়ার্ড থার্স্টন।

তিনি যা ভেবেছিলেন, বিশ বছর পরে তাই-ই করলেন। এই থিয়েটার হলে তিনি জাদু দেখাতে এলেন। অনুষ্ঠান শেষ করার পর থিয়েটার হলের পিছনে গেলেন এবং যে জায়গায় তিনি গৃহহীন ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় শুয়ে-শুয়ে নিজের নামের আদ্যাক্ষরটা দেয়ালের গায়ে খোদাই করছিলেন, সেটা দেখালেন।

থার্সটনের ছেলেবেলায় তার বাবা একদিন তাকে নিষ্ঠুরভাবে মারলেন। থার্সটনের অপরাধ হল তিনি একদল ঘোড়াকে বেশি জোরে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। রাগে দুঃখে তিনি চিৎকার করে কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন, পাঁচ বছরে আর ফিরে যান নি। বাবা-মা ভেবেছিলেন, তিনি মারা গেছেন। এরপর তিনি কখনো বক্সগাড়িতে চড়ে, কখনো-বা ভিক্ষা করে, আবার কখনো চুরি করে তার দুঃখজনক দিনগুলো কাটালেন। বিভিন্ন অপরাধের জন্য তিনি অনেকবার গ্রেফতার হলেন এবং বহুবার ফেরারি আসামি হলেন। লোকে তাকে গালাগালি দিল, অভিশাপ দিল আবার লাথি মেরে ট্রেন থেকে ফেলে দিল। তিনি ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় ঘোড়সওয়ার হলেন।

সতের বছর বয়সে নিউইয়র্কে তাঁর জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। যখন তিনি নিউইয়র্কে আটকা পড়লেন তার কাছে তখন একটা ডলারও ছিল না, সাহায্য করার মতো একজন বন্ধুও ছিল না। হাঁটতে হাঁটতে থার্সটন এক উপাসনালয়ে গিয়ে হাজির হলেন। এক খ্রিষ্ট ধর্মপ্রচারককে তখন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করতে শুনলেন, 'তোমার মধ্যে একজন মানুষ আছে।' কথা ক'টি শুনে তিনি অভিভূত ও বিচলিত হলেন! তখন তার মনে স্থির বিশ্বাস জন্মাল, তিনি পাপ করেছেন। সুতরাং তিনি হেঁটে বেদীর কাছে গিয়ে ধর্মপ্রচারকের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে অশ্রু বিসর্জন করলেন, অবশেষে ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করলেন। এবং দু'সপ্তাহ পরে তাকে দেখা গেল চায়না টাউনের এক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি লোকজনকে ধর্মের বাণী শোনাচ্ছেন। তিনি নিজেকে এত সুখী বোধ করলেন যে, তিনি ধর্মপ্রচারক হবেন বলে স্থির করলেন। ম্যাসাচুসেটস-এর এক বাইবেল স্কুলে ভর্তি হলেন থার্সটন এবং নিজের খাওয়া ও থাকার খরচ চালানোর জন্য দারোয়ানের চাকুরি নিলেন। কিন্তু ছয় মাসের পর স্কুলে যান নি তিনি। শেষপর্যন্ত স্থির করলেন যে, তিনি ধর্মপ্রচারক চিকিৎসক হবেন। আর তাই পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য রওনা হলেন।

এ সময় একটা ঘটনা ঘটল, যা তার জীবনের সম্পূর্ণ গতিপথকে পাল্টে দিল। ম্যাসচুসেটস থেকে ফিলাডেলফিয়া যাওয়ার পথে আলবানিতে গাড়ি বদলাতে হবে। ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছেন, ট্রেন আসতে দেরি ভেবে হাঁটতে হাঁটতে এক থিয়েটারে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে আলেকজান্ডার হ্যারম্যান জাদু প্রদর্শন করছেন। আগেই বলেছি, জাদুবিদ্যায় থার্সটনের আগ্রহ ছিল অঢেল। তাই তিনি জাদু সম্রাট হ্যারম্যানের সাথে দেখা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিলেন। হ্যারম্যানের কাছে দীক্ষালাভের জন্য। কিন্তু দরজায় নক করার মতো সাহস হারিয়ে ফেললেন তিনি। পরদিন সকালে জাদুকর হ্যারম্যানকে অনুসরণ করে রেল স্টেশনে গেলেন এবং হ্যারম্যানের দিকে নীরব, নির্বাক ও প্রশংসাপূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। জাদুকর তখন সিরাকিউসে যাচ্ছিলেন, থার্সটন যাবেন ভাবলেন নিউইয়র্কে। টিকেট কিনতে গিয়ে তিনি ভুলবশত সিরাকিউসের টিকেট কিনে ফেললেন। আর এই ভুলটাই বদলে দিল তার ভাগ্য। এই ভুলের জন্য তিনি একজন কিখ্যাত জাদুকর পরিণত হলেন।

থার্সটন যখন একজন বিখ্যাত জাদুকর হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেন, তখন প্রতিদিন তিনি প্রায় এক হাজার ডলার করে রোজগার করলেন। থার্সটন স্বীকার করেছেন, অনেক জাদুকর তার চেয়ে আরো ভালো জাদু বিদ্যা জানতেন। তাহলে, তার সফলতার গোপন রহস্যটা কী ছিল?

তাঁর সফলতার পেছনে মূলত দুটো কারণ নিহিত ছিল–তার ব্যক্তিত্বকে রঙ্গমঞ্চের দর্শকদের মনে গেঁথে দেয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। তিনি মানবপ্রকৃতি উত্তমরূপে অনুধাবন করতে পারতেন এবং প্রদর্শনীতে এভাবে নিজের অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার দ্বারা দর্শকদের মাঝে

আকর্ষণীয়রূপে উপস্থাপন করতেন। আরেকটি হল তিনি তাঁর দর্শকদের ভালোবাসতেন। অনুষ্ঠান শুরুর আগে মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে লাফ ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সতেজ করে তুলতেন। আর বলতে থাকতেন, 'আমি আমার দর্শকদের ভালোবাসি। আমি দর্শকদের আপ্যায়ন করতে চাই। আমি একটি চমৎকার কাজ পেয়েছি এবং আমি বড় সুখী। তিনি বিশ্বাস করতেন, নিজে সুখী না হলে অন্যকে তিনি সুখী করতে পারবেন না।

১৯৩৬ সালের ১৩ এপ্রিল তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি জাদুকরগণের অধ্যক্ষ এবং ইন্দ্রজালরাজরূপে সর্বজনস্বীকৃত হয়েছিলেন। জীবনের শেষ চল্লিশটি বছর হাওয়ার্ড থার্সটন বিক্ষিপ্তভাবে পৃথিবীর বহুদেশে বহুবার ভ্রমণ করেছিলেন। হাজারো দর্শককে জাদুবিদ্যায় অভিভূত করেছিলেন তিনি।

বিশ্বের ছয় কোটিরও বেশি লোক তার প্রদর্শনী দেখেছিল এবং তিনিও লাভ করেছিলেন বিশ লক্ষ ডলার।

হেটি গ্রিন : তার আয় ছিল ঘণ্টায় তিন শ ডলার অথচ

একসময় হেটি গ্রিন ছিলেন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ধনী মহিলা। তার সম্পত্তির মূল্য ছিল প্রায় সাড়ে ছয় কোটি ডলার। এমন কী তার চেয়েও বেশি। এক বিশাল ধনসম্পত্তির মালিক হয়েও অত্যন্ত সস্তা জীবনযাপন করতেন, যে কোনো ঝাড়ুদারনি তা চেয়ে ভালো পোশাক পরে, ভালো খাবার খায় এবং ভালো বিছানায় ঘুমোয়। মোটেই বিলাসিতা করতেন না তিনি।

হেটি গ্রিনের আয় ছিল প্রতিমিনিটে পাঁচ ডলার বা ঘণ্টায় তিনশ ডলার অথচ প্রতিদিন সকালবেলা তিনি দুসেন্ট দিয়ে যে কাগজ কিনতেন তা পড়ে আবার বিক্রি করে দিতেন। দেশের প্রায় প্রত্যেকটা রেলপথের বন্ড তার ছিল, দুটো রেলপথ সবসুদ্ধ কিনে ফেলেন অথচ রেলগাড়িতে ভ্রমণের সময় বিলাস কামরায় না বসে সাধারণ কামরাতেই বসে ভ্রমণ করতেন।

অত্যন্ত নিম্নমানের এবং কমদামি খাবার খেতেন হেটি গ্রিন; কিন্তু তিনি ছিলেন সুন্দরী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। আটাত্তর বছর বয়সে তার কমনীয় স্বাস্থ্যের গোপন রহস্য সম্পর্কে এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করায় তিনি বলছেন, সকালবেলা একটুকরো কেবল মাংস, আলু ভাজি, এক পেয়ালা চা ও দুধ দিয়ে নাস্তা করতেন; মাংসের টুকরো ও দুধের জীবাণু মারার জন্য সারা দিন ধরে সেঁকা পেঁয়াজ চিবোতেন।

১৮৯৩ সালের এক রোদঝলসানো গরম দিনে হেটি গ্রিন বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এক গুদামঘরের চিলেকোঠায় উঠলেন। টিনের চালের নিচে অত্যন্ত গরমের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে রঙিন কাপড়ের টুকরো থেকে সাদা টুকরোগুলো আলাদা করতেন। এ কাজের জন্য খরিদ্দার প্রতি পাউন্ডের জন্য তাকে এক সেন্ট মূল্য বেশি দিত।

তার জমানো টাকার হিসেব দেখাশোনা করার জন্য অধিক সময় তাকে ওয়েল স্ট্রিটে কাটাতে হত। তিনি জানতেন, যদি নিউইয়র্ক সিটিতে একটা রুম ভাড়া নেন অথবা যদি একখণ্ড আসবাবপত্রেরও মালিক হন তা হলে ট্যাক্স কালেক্টর তার কাছ থেকে ছোঁ মেরে একটা মোটা অঙ্কের টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। তাই ট্যাক্স কালেক্টরের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য একটা সস্তা বাসা থেকে আরেকটা সস্তা বাসায় সরে যেতেন। তিনি ছদ্মনামে বাসা ভাড়া করতেন, ছেঁড়া কাপড় পরে থাকতেন। সাথে এত সামান্য জিনিসপত্র রাখতেন। যে তার সন্দেহে প্রধান বাড়িওয়ালারা তার রাত্রিযাপনের ভাড়াটা অগ্রিম আদায় করে ছাড়ত। তার এক বান্ধবী তাকে সৌন্দর্যচর্চার প্রসাধনীর জন্য তিনশ ডলার ব্যয় করতে রাজি করাল। তাকে গ্রারান্টি দেয়া হল যে এই প্রসাধনী ব্যবহার করলে তার বয়স কম দেখাবে।

হেটি গ্রিন নিউইয়র্কের কেমিক্যাল ন্যাশনাল ব্যাংকে কয়েক মিলিয়ন ডলার জমা রেখেছিলেন। চেক জালিয়াতের ভয়ে নিত্যন্ত বাধ্য না হলে তিনি চেকে সই করতেন না। তার ট্রাঙ্ক ও স্যুটকেসগুলো ব্যাংকে জমা রাখতেন। তিনি একটি এক ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ব্যাংকে আসতেন, এর চাকাগুলো খুলে ব্যাংকের দোতালায় উঠিয়ে রাখতেন।

হেটি গ্রিন অনেক দিক দিয়ে ছিলেন দয়ালু হৃদয়ের। ন্যাশনাল ব্যাংকে এক দারোয়ান ছিলেন, একবার ব্যাংক থেকে তাকে বরখাস্ত করায় হেটি গ্রিন তার জন্যে এত দুঃখ বোধ করেছিলেন যে, তিনি নিজে একসপ্তাহ সময় ব্যয় ও খোঁজাখুঁজি করে তাকে আরেকটা চাকরি যোগাড় করে দিলেন।

হেটি গ্রীন একাশি বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর শেষ পীড়ায় যে সেবিকারা সেবা করতে এসেছিল তাদের সাদা ইউনিফর্ম পরতে দেয়া হয় নি। তারা রাস্তায় বেড়ানোর পোশাক পরত যাতে হেটি ভাবেন যে সাধারণ ভৃত্য, কারণ যদি হেটি সন্দেহ করতেন যে তারা ব্যয়বহুল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবিকা তাহলে তিনি শান্তিতে মরতে পারতেন না।

হেলেন কিলার : যাকে নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল

জন্মগ্রহণের সময় হেলেন কিলার ছিলেন একটি স্বাভাবিক শিশু। তাঁর জীবনের প্রথম দেড়টি বছর অন্যান্য শিশুদের মতোই দেখতে ও শুনতে পেতেন এমনকি কথাও বলতে পারতেন। হঠাৎ করে এক মহাদুর্যোগ দেখা দিল তার জীবনে। তিনি ভয়ানক অসুখে পড়লেন। মাত্র উনিশ মাস বয়সেই হয়ে গেলেন বধির, বোবা এবং অন্ধ। তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ নয়টি বছর তিনি বাকশক্তিহীন ছিলেন। অথচ এই মহিলাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি রাজ্যে বক্তৃতা করেছেন এবং ইউরোপের সব দেশ ভ্রমণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ছোটবেলায় অবোধ বন্যপ্রাণীদের মতো তিনি বড় হতে থাকলেন বোবা, কালা ও অন্ধত্বের অভিশাপ নিয়ে। যা কিছু তার খারাপ লাগত তাই ভেঙে তছনছ করে ফেলতেন। তিনি দু-হাত দিয়ে মুখে খাবার খুঁজতেন; এ অভ্যাস শুধরাবার চেষ্টা করলে তিনি রাগে হাত পা ছুঁড়ে মেঝেতে গড়াগড়ি দিতেন আর চিৎকার করে কাঁদার চেষ্টা করতেন।

অবশেষে হেলেন কিলারের অসুখী বাবা-মা বোস্টনের একটি অন্ধ প্রতিষ্ঠানে হেলেন কিলারকে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে এ্যান মেনসফিল্ড সুলিভান নামক এক মহিলা হেলেন কিলারকে সারিয়ে তোলার ও শিক্ষাদানের অসম্ভব কাজটির দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। মিস্ সুলিভানের বয়স ছিল তখন মাত্র কুড়ি। নিজের জীবনটা ছিল অত্যন্ত দুঃখময় ও দারিদ্র্যপূর্ণ।

এ্যান সুলিভান ও তার এক ছোট ভাইকে ম্যাসাচুসেট্‌স-এ এক দরিদ্র ভবনে পাঠানো হয়েছিল। দরিদ্র ভবনে এত বেশি গরিব ছেলেমেয়ে থাকত যে, ওদের দুজনকে মৃতের ঘরে ঘুমুতে হত, এ ঘরে যেসব মৃতব্যক্তিকে কবর দেয়া হবে তাদেরকে রাখা হত। ছ'মাস পরে সুলিভানের ছোটভাইটি মারা যায় দরিদ্র ভবনে। আর সুলিভান ও চৌদ্দ বছর বয়সে প্রায় অন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। যার জন্য তাকে পরে অন্ধ প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়। এ্যান সুলিভান সেখানে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান এবং পরবর্তীতে হেলেন কিলারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

এ্যান সুলভান কীভাবে হেলেন কিলারের মধ্যে অলৌকিক পরিবর্তন ঘটালেন এবং তার মনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন তা একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। হেলেন কিলারের লেখা আমার জীবন কাহিনী'তে উদ্ধৃত আছে, যেদিন হেলেন কিলার প্রথম কথা বলতে শিখলো সেদিনের তার আনন্দটি অপরিমেয়।

হেলেন কিলারের বয়স যখন বিশ বছর, লেখাপড়ায় তিনি যথেষ্ট অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছিলেন। ওই সময় তিনি রেডক্লিক কলেজে ভর্তি হন। তিনি কেবল শিখতে ও পড়তে পেরেছিলেন তা নয়, তার বাকশক্তিও ফিরে পেয়েছিলেন। তিনি যে বাক্যটি প্রথম শিখলেন তা হল—'আমি এখন আর বোবা নই।' কথাগুলো বলতে পারার আনন্দে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন।

মার্ক টোয়েন বলেছেন, উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুটি চরিত্র হল সম্রাট নেপোলিয়ান এবং হেলেন কিলার। আজ এ বিংশ শতাব্দীতেও হেলেন কিলার পৃথিবীর

অন্যতম শ্রেষ্ঠ উল্লেখযোগ্য চরিত্র হয়ে বিরাজ করছেন। হেলেন কিলার ছিলেন সম্পূর্ণ অন্ধ; কিন্তু দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন বহু লোকের চেয়েও তিনি অধিক সংখ্যক বই পড়তে সক্ষম হয়েছেন। একজন সাধারণ মানুষের চেয়েও একশ গুণ বেশি বই পড়েছেন এবং নিজেও লিখেছেন এগারোটি। নিজের জীবনকাহিনী অবলম্বনে তিনি একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন এবং তাতে অভিনয়ও করেছেন। আরো আশ্চর্যের বিষয় তিনি বধির হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ সুস্থ লোকের চেয়েও তিনি সঙ্গীত উপভোগ করতেন বেশি। তিনি এখন সামান্য বিদেশী উচ্চারণে কথা বলতে পারেন। হেলেন কিলার যখন হাঁটেন তখন প্রায়ই আপন মনে কথা বলেন কিন্তু আপনার আমার মতো ঠোঁট নাড়েন না, বরং আঙুল নেড়ে সাঙ্কেতিক ভাষায় নিজের সাথে কথা বলেন। অনেকে মনে করেন যে, যেহেতু তিনি অন্ধ, তার হয়তো রহস্যজনক ষষ্ঠেন্দ্রিয় আছে। তার আরেকটি অদ্ভুত দক্ষতা ছিল, তা হল তার বন্ধুরা যখন তার সাথে কথা বলত, তারা কী বলত তা তিনি তাদের ঠোঁটের উপর আলতোভাবে আঙুল রেখে বুঝতে পারতেন।

তিনি পিয়ানো বা বেহালার কাঠের উপর হাত রেখে সঙ্গীত উপভোগ করতেন। গায়কের গলার উপর আলতোভাবে নিজের আঙুল রেখে গান উপভোগ করতেন এমনকি কেবিনেটের অনুকম্পন অনুভবের মাধ্যমে রেডিও শুনতেন! যদি হেলেন কিলার আজ আপনার সাথে পরিচিত হতে গিয়ে করমর্দন করেন এবং পাঁচ বছর পর আপনার দেখা হয় এবং করমর্দন করেন; ওই করমর্দন দ্বারাই তিনি আপনাকে মনে করতে ও চিনতে পারবেন এবং আরো বলতে পারবেন আপনি ক্রুদ্ধ নাকি সন্তুষ্ট ছিলেন, নাখোশ ছিলেন না খুশি ছিলেন।

হেলেন কিলার সাঁতার কাটতেন এবং নৌকা বাইতে পারতেন। তিনি জঙ্গলের মধ্যদিয়ে অত্যন্ত দ্রুত বেগে ঘোড়া চালাতে পছন্দ করতেন। তিনি চেকারস ও দাবা খেলতেন এমনকি তাস দিয়ে সলিটেয়ার খেলতেন। বৃষ্টির দিনে তিনি সেলাই করতেন অথবা কুরুশ কাঁটা দিয়ে কাপড় বুনে সময় কাটাতেন। আমাদের সবার ধারণা, অন্ধ হওয়াটা মানুষের জীবনের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু হেলেন কিলার এটাকে কখনো দুর্ভাগ্যজনক মনে করেন নি। শুধু এক পরিপূর্ণ অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা তাকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার কারণে বন্ধুসুলভ মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে না পাওয়ার ব্যথা হেলেন কিলারকে সবসময় পীড়া দেয়।